মাসিক
আল-আবরার
The Monthly AL-ABRAR
রেজি. নং- ১৪৫ বর্ষ-৩, সংখ্যা-০৯

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

অক্টোবর ২০১৪ইং, জিলহজ্ব ১৪৩৫হি:, আশ্বিন ১৪২১বাং

ذو الحجة ١٤٣٥ اكتوبر ٢٠١٤م

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক
ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম)
প্রধান সম্পাদক
মুফতী আরশাদ রহমানী
সম্পাদক
মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক
নির্বাহী সম্পাদক
মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী
সহকারী সম্পাদক
মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
মুহাম্মদ হাশেম
সার্কুলেশন ম্যানেজার
হাফেজ আখতার হোসাইন

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা
মুফতী এনামুল হক্ব কাসেমী
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র
প্রচার সংখ্যা : ১০,০০০ (দশ হাজার)

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে :..... ৩
পবিত্র সুন্নাহ থেকে : ৫
হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ৬
মাওয়ায়েযে ফক্বীহুল মিল্লাত : ৭
"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ : নির্ধারিত এক মাযহাবের তাকলীদ ও অতীতের উলামায়ে কেরাম..... ৯
মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক
কুরবানী তাৎপর্য, ফজীলত ও প্রয়োজনীয় মাসায়েল..... ১৩
মুফতী শাহেদ রহমানী
মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-৯..... ২১
মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
দারুল উলুম দেওবন্দ : দ্বীন প্রচারের সূতিকাগার ২৫
হাফেজ রিদওয়ানুল কাদির উখিয়াভী
লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-৬..... ৩১
সায়্যিদ মুফতী মাসূম সাক্বিব ফয়জাবাদী কাসেমী
মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার ৫..... ৩৭
মাও. ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৪০
ইসলামে মানবাধিকার-৬..... ৪৩
মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফক্বীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২৮৪০২০৯১,০২৮৮৪৫১৩৮
ইমেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.com
www.monthlyalabrar.wordpress.com
www.facebook.com/মাসিক-আল-আবরার

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক: ০১১৯১২৭০১৪০ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১১৯১৯১১২২৪

সম্পাদকীয়

শান্তি-সমৃদ্ধির মূল 'আমানতের' হেফাজত

যে দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে, কল্যাণ, সমৃদ্ধি, উন্নয়ন। এর নামই ইসলাম। যার প্রতিটি শাখা-প্রশাখা, আইন-বিধান, বাণী-ব্যাখ্যাতেই মানবতার সুনিশ্চিত সফলতা ও বিজয় সন্নিবেশিত। নিবিষ্টচিত্তে ইসলামের একেকটি বিষয় ব্যাখ্যা করা হলে পরিদৃষ্ট হবে পুরো মানবতার সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে এতেই।

ইসলামের একটি বাণী হলো, 'আমানত রক্ষা করা'। আমানত শব্দটির ব্যাখ্যা ও ব্যাপ্তি অত্যন্ত ব্যাপক। মানুষের যেকোনো চিন্তা-চেতনা, কাজ ও পদচারণার সাথে আমানতের আবেদনটা মৌলিকভাবে বিদ্যমান। ধর্ম, জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে আমানতের দ্যুতি থেকে উপকৃত হতে পারে। আবার এর বিপরীত গুণ চর্চায় হতে পারে চির পরাজিত, অপমানিত। ক্ষতির দীর্ঘ খেসারতের হিসাবও কষতে হতে পারে এর কারণে। এটি মানবতার একটি প্রাকৃতিক আবেদন।

মানুষের জন্য পন্থা দুটোই। হয় সে আমানতকে তার ব্যাপক ব্যাখ্যা অনুসারে রক্ষা করবে অথবা করবে না। যার জীবনে ইতিবাচক দিকটাই প্রাধান্য পাবে, কল্যাণের জ্যোতিতে সে হবে দেদীপ্যমান। অন্যথায় অকল্যাণ হবে তার চির সাথী।

মানুষের যোগ্যতা, মেধা, শক্তি, ধন-সম্পদ এমনকি তার প্রতিটি অঙ্গপ্রতঙ্গও আল্লাহর আমানত। এসবকে যে ব্যক্তি সঠিক পথে যথাযথভাবে পরিচালিত করবে বলা হবে সে আমানত রক্ষা করছে। অন্যথায় সে খিয়ানতকারী। তেমনি পার্থিবভাবে মানুষ যে যেই দায়িত্বের অধিকারী সেটিও তার কাছে আমানতস্বরূপ। যেকোনো দায়িত্বের সাথে সাথে মানুষের একটি অর্জন থাকে তদসংশ্লিষ্ট ক্ষমতা। মূলত মানুষ ততটুকু ক্ষমতারই অধিকারী হয়, যেটুকু উক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য আবশ্যক। এতদুভয়ের ক্ষেত্রে আমানত রক্ষার বিষয়টি আরো প্রকটভাবে আবশ্যক হয়ে পড়ে। বিশেষ করে মানুষের সামষ্টিক জীবনে। সামষ্টিক জীবনে যে যেরূপ দায়িত্বপ্রাপ্ত হোক না কেন, সেখানে সাধারণ মানুষের হক জড়িত থাকে। তাই সামষ্টিক জীবনের এই দিকটার গুরুত্ব অপরিসীম।

যেমন রাষ্ট্র পরিচালক, বিচারক, সমাজে নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিবর্গ, সমাজপতি এমনকি গৃহকর্তাও। সবার ক্ষেত্রে নিজের অধীনস্তদের বিশাল হক ও আমানত থেকে যায়। এই আমানতকে যথাযথভাবে রক্ষা করা ও আদায় করা আবশ্যক। এই আমানত রক্ষার ওপরই জাতি, রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার তথা সবার মাঝে শান্তি-অশান্তি নির্ভর করে।

সামষ্টিক জীবনে দায়িত্বশীলদের ক্ষেত্রে আমানত দুটি। একটি স্বয়ং দায়িত্ব, অপরটি তদসংশ্লিষ্ট ক্ষমতা। কোনো দায়িত্বশীল যদি তার দায়িত্বের আমানতকে সুষ্ঠুভাবে পালন না করে সেটা যেমন খিয়ানত, তেমনি উক্ত দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ক্ষমতার অপব্যবহারও খিয়ানতের অন্তর্ভুক্ত।

আমানতের রশ্মি মানুষের সর্ব বিভাগকে পরিবেষ্টন করে আছে বলেই হাদীস শরীফে এসেছে–

যার মাধ্যে আমানত নেই, তার ঈমানও নেই। অর্থাৎ আমানত ও ঈমান একটি অপরটির সম্পূরক। অথবা আমানতবিহীন ঈমান কোনো কাজে আসবে না। এখানে আমানত থেকে তার ব্যাপক অর্থও উদ্দেশ্য করা যায়।

পবিত্র কুরআনে এসেছে–

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সা.) ও তোমাদের ওপর ন্যস্ত আমানতের খেয়ানত করো না। অথচ তোমরা এর গুরুত্ব জানো। {সূরা আনফাল, আয়াত-২৭}

আরেকটি হাদীসে এসেছে–

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যদি তোমার মধ্যে চারটি জিনিস থাকে; তবে পার্থিব কোনো কোনো জিনিস হাতছাড়া হয়ে গেলেও তোমার ক্ষতি হবে না। (১.) আমানতের হেফাজত (২.) সত্য ভাষণ (৩.) উত্তম চরিত্র ও (৪.) পবিত্র রিযিক। {মুসনাদে আহমদ}

প্রাকৃতিক অন্যান্য চাহিদা পূরণের মতোই সব মানুষের কামনা হলো তার আমানত সংরক্ষিত থাকুক। তাতে কোনো প্রকার খেয়ানত না হোক। এ কারণেই সামাজিক জীবনে পরস্পরের প্রতিই বেশি দোষ চাপানো হয়। পরস্পরকে কাবু করার বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হয়। কিন্তু আপন স্তর হিসেবে নিজের কাছে অন্যের যে আমানত তা আমরা কতটুকু সংরক্ষণ করতে পারছি। কতটুকু আপন আপন দায়িত্বপূরণে আমরা সতর্ক। এ ক্ষেত্রে আমাদের উদাসীনতাই বেশি। অথচ একটি সমাজের স্থিতিশীলতা, উন্নয়ন এবং সুখ-সমৃদ্ধি নির্ভর করে এর ওপরই। অর্থাৎ নিজের দায়িত্ব সচেতনতা। নিজের কাছে অন্যের যে আমানত তা সংরক্ষণ এবং যথাযথভাবে পূরণ করা।

বর্তমান বিশ্বেও বিভিন্ন দেশের উপরস্ত কর্মকর্তা নিজের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার দায়ে স্বপদ থেকে পদত্যাগ করেন। এর অর্থ হলো আমি আমানত রক্ষা করতে পারিনি, তাই আমি ব্যর্থ। আমি এ পদের যোগ্য নই। এটি হলো এক প্রকার মানবতার বহিঃপ্রকাশ।

এরূপ নজির মুসলমানদেরই বেশি স্থাপন করা আবশ্যক ছিল। কারণ এরূপ গুণাবলীর মূল প্রশিক্ষক ইসলাম। রাসূল (সা.)-এর অমোঘ শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটি।

এখানে ইসলামের একটি গুণের কথাই বলা হলো। ইসলাম এরূপ অসংখ্য গুণের সমষ্টি। ইসলামের দাবি হলো, মানুষ এসব মানবিক গুণে গুণান্বিত হোক। যাবতীয় পাশবিকতা পরিহার করে তাদের উভয় জীবনকে কল্যাণময় করুক। সুখ-সমৃদ্ধি হোক তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী।

আরশাদ রহমানী

ঢাকা।

২৩-০৯-২০১৪

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

وَالْفَجْرِ (١) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (٢) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (٣) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (٤) هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (٥) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٩) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (١٠) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (١١) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (١٢) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (١٣) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (١٤)

(১) শপথ ফজরের (২) শপথ দশ রাত্রির (৩) শপথ তার, যা জোড় ও বেজোড় (৪) এবং শপথ রাত্রির যখন, তা গত হতে থাকে (৫) এর মধ্যে আছে শপথ জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য। (৬) আপনি কি লক্ষ করেননি, আপনার পালনকর্তা আ'দ বংশের ইরাম গোত্রের সাথে কী আচরণ করেছিলেন, (৭) যাদের দৈহিক গঠনস্তম্ভও খুঁটির মতো দীর্ঘ ছিল এবং (৮) যাদের সমান শক্তি ও বলবীর্যে সারা বিশ্বের শহরসমূহে কোনো লোক সৃজিত হয়নি। (৯) এবং সামুদ গোত্রের সাথে যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল (১০) এবং বহু কীলকের অধিপতি ফেরাউনের সাথে, (১১) যারা দেশে সীমালঙ্ঘন করেছিল। (১২) অতঃপর আপনার পালনকর্তা তাদেরকে শাস্তির কশাঘাত করলেন। (১৪) নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

এই সূরায় পাঁচটি বস্তুর শপথ করে ان ربك لبالمرصاد আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুকে জোরদার করা হয়েছে। অর্থাৎ দুনিয়াতে তোমরা যা কিছু করো, তার শাস্তি ও প্রতিদান অপরিহার্য ও নিশ্চিত। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের যাবতীয় কাজকর্মের প্রতি সতর্কদৃষ্টি রাখছেন।

শপথের পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম বিষয় হচ্ছে, ফজর অর্থাৎ সুবহে সাদেকের সময়। এখানে প্রতিদিনের প্রভাতকালও উদ্দেশ্য হতে পারে। কারণ প্রভাতকাল বিশ্বে এক মহাবিপ্লব আনয়ন করে এবং আল্লাহ তা'আলার অপর কুদরাতের দিকে পথ প্রদর্শন করে। তাফসীরবিদ সাহাবী হযরত আলী, ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবায়ের (রা.) থেকে প্রথম অর্থ এবং ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে ও হযরত কাতাদাহ (রা.) থেকে দ্বিতীয় অর্থ অর্থাৎ মহররম মাসের প্রথম তারিখের প্রভাতকাল বর্ণিত হয়েছে। এ দিনটি ইসলামী চন্দ্র বৎসরের সূচনা।

কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন যিলহজ মাসের দশম তারিখের প্রভাতকাল। মুজাহিদ ও ইকরমা (রা.)-এর উক্তিও তাই। বিশেষ করে এদিনের শপথ করার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি দিনের সাথে একটি রাত সংযুক্ত করে দিয়েছেন, যা ইসলামী নিয়মানুযায়ী দিনের পূর্বে থাকে। একমাত্র ইয়াওমুন্নহর তথা যিলহজের দশ তারিখ এমন একটি দিন, যার সাথে কোনো রাত নেই। এ কারণেই কোনো হাজী যদি আয়াওমে আরাফা তথা নবম তারিখে দিনের বেলায় আরাফাতের ময়দানে পৌঁছতে না পারে এবং রাতে সুবহে সাদেকেরে পূর্বে কোনো সময় পৌঁছে যায়, তবে তার আরাফাত অবস্থান সিদ্ধ ও হজ শুদ্ধ হয়ে যাবে। এ থেকে জানা গেল যে, আরাফা দিবসের রাত দুটি একটি পূর্বে ও একটি পরে এবং ইয়াওমুন্নহর তথা দশম তারিখের কোনো রাত নেই। এদিক দিয়ে এ দিনটি সব দিনের তুলনায় বিশেষ শানের অধিকারী। (কুরতুবী)

শপথের দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, দশ রাত্রি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও কাতাদাহ এবং মুজাহিদ (রা.) প্রমুখ তাফসীরবিদের মতে, এতে যিলহজের প্রথম দশ রাত্রি বোঝানো হয়েছে। কেননা, হাদীসে এসব রাত্রির ফযীলত বর্ণিত রয়েছে। রাসূল (সা.) বলেন, ইবাদত করার জন্য আল্লাহর কাছে যিলহজের দশ দিন সর্বোত্তম দিন। এর প্রত্যেক দিনের রোযা এক বছর রোযার সমান এবং প্রত্যেক রাত্রির ইবাদত শবে কদরের ইবাদতের সমতুল্য। (মাযহারী) হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বয়ং والفجر وليال عشر এর তাফসীর করেছেন যিলহজের দশ দিন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীতে واتممنا ها بعشر বলে এই দশ রাত্রিকেই বোঝানো হয়েছে। কুরতুবী বলেন, হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীস থেকে জানা গেল যে, যিলহজের দশ দিন সর্বোত্তম দিন এবং এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, মূসা (আ.)-এর জন্যও এই দশ দিনই নির্ধারিত করা হয়েছিল।

والشفع والوتر এ দুটি শব্দের আভিধানিক অর্থ যথাক্রমে জোড় ও বেজোড়। এই জোড় ও বেজোড় বলে আসলে কী বোঝানো হয়েছে আয়াত থেকে নির্দিষ্ট জানা যায় না। তাই এ ব্যাপারে তাফসীরকারগণের উক্তি অসংখ্য। কিন্তু হযরত জাবের (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন–

الوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر অর্থাৎ وتر এর অর্থ আরাফা দিবস। (যিলহজের নবম তারিখ) এবং شفع এর অর্থ ইয়াওমুন্নহর (যিলহজের দশ তারিখ)।

কুরতুবী (রহ.) এ হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেন, এটা সনদের দিক দিয়ে এমরান ইবনে হুসাইন (রা.) বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা অধিক সহীহ, যাতে জোড় ও বেজোড় নামাযের কথা আছে। তাই হযরত ইবনে আব্বাস, ইকরমা (রা.) প্রমুখ তাফসীরবিদ প্রথমোক্ত তাফসীরই অবলম্বন করেছেন।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, জোড় বলে সমগ্র সৃষ্টিজগৎ বোঝানো হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টিকে

জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন, ومن كل شئ خلقنا زوجين অর্থাৎ আমি সব কিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। যথা, কুফর ও ঈমান, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, আলো ও অন্ধকার, রাত্রি ও দিন, শীত ও গ্রীষ্ম, আকাশ ও পৃথিবী, জিন ও মানব এবং নর ও নারী। এগুলোর বিপরীতে বেজোড় একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সত্তা। هو الله الاحد الصمد

والليل اذا يسر–يسرى অর্থ রাত্রিতে চলা। অর্থাৎ রাত্রির শপথ, যখন সে চলতে থাকে তথা খতম হতে থাকে। এই পাঁচটি শপথ উল্লেখ করার পর আল্লাহ তা'আলা গাফিল মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য বলছেন – هل في ذلك قسم لذى حجر - حجر শব্দের অর্থ বাধা দেওয়া। মানুষের বিবেক মানুষকে মন্দ ও ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে বাধাদান করে। তাই حجر এর অর্থ বিবেকও হয়ে থাকে। এখানে তা-ই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, বিবেকবানের জন্য এসব শপথ যথেষ্ট কি না? এই প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে মানুষকে গাফিলতি থেকে জাগ্রত করার একটি কৌশল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য সম্পর্কে, তাঁর শপথ করে কোনো বিষয় বর্ণনা করা সম্পর্কে এবং শপথের বিষয়সমূহের মাহাত্ম্য সম্পর্কে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে, যে বিষয়ের জন্য শপথ করা হয় তার নিশ্চয়তা প্রমাণিত হয়ে যাবে। এখানে যে বিষয়ের জন্য শপথ করা হয়েছে, তা এই যে, মানুষের প্রত্যেক কর্মের পরকালে হিসাব হওয়া এবং তার শাস্তি ও প্রতিদান হওয়া সন্দেহ ও সংশয়ের ঊর্ধ্বে। শপথের এই জবাব পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়নি কিন্তু পূর্বাপর বর্ণনা থেকে থেকে বোঝা যায়। পরবর্তী আয়াতসমূহে কাফিরদের ওপর আযাব আসার কথা বর্ণনা করেও এ কথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কুফর ও গোনাহের শাস্তি পরকালে হওয়া তো স্থিরীকৃত বিষয়ই। মাঝে মাঝে দুনিয়াতেও তাদের প্রতি আযাব প্রেরণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে তিনটি জাতির আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এক আ'দ বংশ, দুই. সামুদ গোত্র এবং তিন. ফিরাউন সম্প্রদায়। আ'দ ও সামুদ জাতিদ্বয়ের বংশতালিকা উপরের দিকে ইরামে গিয়ে এক হয়ে যায়। এভাবে ইরাম শব্দটি আ'দ ও সামুদ উভয়ের বেলায় প্রযোজ্য।

ارم ذات العماد এখানে ইরাম শব্দ ব্যবহার করে আ'দ গোত্রের পূর্ববর্তী বংশধর তথা প্রথম আ'দকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তারা দ্বিতীয় আদের তুলনায় আদের পূর্বপুরুষ ইরামের নিকটতম বিধায় তাদেরকে আ'দে ইরাম শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। তাদেরকেই এখানে عاد ارم শব্দ দ্বারা এবং সূরা নাজমে عاد الاولى শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে তাদের বিশেষণে বলা হয়েছে – عمود و عماد - ذات العماد শব্দের অর্থ স্তম্ভ। তারা অত্যন্ত দীর্ঘকায় জাতি ছিল বিধায় তাদেরকে ذات العماد বলা হয়েছে। এই আ'দ জাতি দৈহিক গঠন ও শক্তি সাহসে অন্য সব জাতি থেকে স্বতন্ত্র ছিল। কুরআন পাক তাদের এই স্বাতন্ত্র্য পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছে – لم يخلق مثلها في البلاد অর্থাৎ এমন দীর্ঘকায় ও শক্তিশালী জাতি ইতিপূর্বে পৃথিবীতে সৃজিত হয়নি। এতদসত্ত্বেও কুরআন তাদের দেহের মাপ অনাবশ্যক বিবেচনা করে উল্লেখ করেনি। ইসরায়েলী রেওয়ায়াতসমূহে তাদের দৈহিক গঠন ও শক্তি সম্পর্কে অদ্ভুত ধরনের কথাবার্তা বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও মুকাতিল (র.) থেকে তাদের উচ্চতা বারো হাত তথা ১৮ ফুট বর্ণিত আছে। বলাবাহুল্য, তাঁরা ইসরায়েলী রেওয়াতদৃষ্টেই এ কথা বলেছেন। কোনো তাফসীরবিদ বলেন, ইরাম আ'দ নয় শাদ্দাদ নির্মিত বেহেশতের নাম। এরই বিশেষণ ذات العماد কেননা এই অনুপম প্রাসাদটি বহু স্তম্ভের ওপর দণ্ডায়মান এবং স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণিমুক্তা দ্বারা নির্মিত ছিল, যাতে মানুষ পরকালের বেহেশতের পরিবর্তে এই নগদ বেহেশতকে পছন্দ করে নেয়। কিন্তু এই বিরাট প্রাসাদের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হওয়ার পর যখন শাদ্দাদ সভাসদ সমভিব্যাহারে এ বেহেশতে প্রবেশ করার ইচ্ছা করল, তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব নাযিল হলো। ফলে সবই ধ্বংস এবং কৃত্রিম বেহেশতও ধূলিসাৎ হয়ে গেল। (কুরতুবী) এ তাফসীরের দিক দিয়ে আয়াতে আ'দ গোত্রের একটি বিশেষ আযাব বর্ণিত হয়েছে, যা শাদ্দাদ নির্মিত বেহেশতের ওপর নাযিল হয়েছে। প্রথম তাফসীর অনুযায়ী এতে আ'দ গোত্রের আযাবের কথাই বর্ণিত হয়েছে।

وفرعون ذى الاوتاد - وتد শব্দটি اوتاد এর বহুবচন। এর অর্থ কীলক। ফিরাউনকে কীলকওয়ালা বলার বিভিন্ন কারণ তাফসীরবিদগণ বর্ণনা করেছেন। এই শব্দের সাথে তার জুলুম নিপীড়ন ও শাস্তি? বর্ণনা রয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এ কারণই প্রসিদ্ধ। ফিরাউন যার প্রতি কুপিত হতো, তার হস্তপদ চারটি কীলকে বেঁধে অথবা চার হাত-পায়ে কীলক মেরে রৌদ্রে শুইয়ে দিত এবং তার দেহে সর্প ও বিচ্ছু ছেড়ে দিত। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ প্রসঙ্গে ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়ার ঈমান প্রকাশ করা এবং ফিরাউন কর্তৃক তাঁকে এ ধরনের শাস্তি দেওয়ার দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। (মাযহারী)

فصب عليهم ربك سوط عذاب আ'দ, সামুদ ও ফিরাউন গোত্রের অপকীর্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে তাদের আযাবকে কশাঘাতের শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কশাঘাত যেমন দেহের বিভিন্ন অংশে হয়, তেমনি তাদের ওপরও বিভিন্ন প্রকার আযাব নাযিল করা হয়।

ان ربك لبالمرصاد - مرصد ও مرصاد শব্দের অর্থ সতর্কদৃষ্টি রাখার ঘাঁটি, যা কোনো উচ্চ স্থানে স্থাপিত হয়ে থাকে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি লোকের প্রতিটি ক্রিয়াকর্ম ও গতিবিধির ওপর দৃষ্টি রাখছেন এবং সবাইকে প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ বাক্যকে পূর্বোক্ত শপথ বাক্যসমূহের জওয়াব সাব্যস্ত করেছেন।

পবিত্র সুন্নাহ থেকে

উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

দ্বীনের নামে দুনিয়া উপার্জনকারী রিয়াকারদের জন্য কঠোর সতর্কবাণী

عن ابى هريرة قال قال رسول الله ﷺ يخرج فى اخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضان من اللين السنتهم احلى من السكر وقلوبهم قلوب الذياب يقول الله ابى يغترون ام على يجترؤن فبى حلفت لابعثن على اولئك منهم فتنة تدع الحليم فيهم حيران (رواه الترمذى)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, শেষ যুগে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা দ্বীনের আড়ালে দুনিয়া শিকার করবে। তারা মানুষের ওপর নিজেদের দরবেশী জাহির করার জন্য এবং তাদেরকে প্রভাবিত করার জন্য ভেড়ার চামড়ার পোশাক পরিধান করবে। (অর্থাৎ মোটা কাপড় ও কম্বল পরিধান করে নিজকে সুফী দরবেশ বলে প্রকাশ করবে) তাদের মুখের ভাষা হবে চিনির চেয়ে অধিক মিষ্টি। কিন্তু তাদের অন্তর হিংস্র বাঘের অন্তরের মতো। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, এরা কি আমার অবকাশ পেয়ে ধোঁকা খাচ্ছে, না আমার ওপর দুঃসাহস দেখাতে চায়? আমার শপথ করে বলছি, আমি তাদের মধ্য থেকেই তাদের ওপর এমন ফিতনা চাপিয়ে দেব, যা তাদের জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদেরকেও দিশেহারা করে ছাড়বে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, রিয়াকারীর এ প্রকারটি সবচেয়ে মন্দ ও ঘৃণিত যে, মানুষ দরবেশ ও বুযুর্গদের আকৃতি ও বেশ ধারণ করে এবং নিজেদের অভ্যন্তরীণ অবস্থার বিপরীত মুখে নরম ও মিষ্টি কথা বলে সরলপ্রাণ লোকদেরকে নিজের ভক্তির জালে আবদ্ধ করার অপচেষ্টা চালায় এবং এভাবে দুনিয়া উপার্জনের কৌশল খাটায়। এসব লোককে আল্লাহ তা'আলা সতর্ক করে বলেছেন যে, মৃত্যুর পূর্বেই এ দুনিয়াতেই তারা কঠিন পরীক্ষা ও ফেতনার সম্মুখীন হবে।

রিয়াকার আবেদ ও আলেমদের জাহান্নামে কঠিন শাস্তি :

عن ابى هريرةؓ قال قال رسول الله ﷺ تعوذوا بالله من جب الحزن قالوا يارسول الله ﷺما جب الحزن؟ قال واد فى جهنم يتعوذ منه جهنم كل يوم اربع مائة مرة، قيل يارسول الله ومن يدخلها؟ قال القرآء المراؤن باعمالهم

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা দুঃখের কূপ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, দুঃখের কূপ কী? তিনি উত্তর দিলেন, এটা জাহান্নামের একটা প্রান্তর অথবা পরিখা। (যার অবস্থা এতই খারাপ যে,) স্বয়ং জাহান্নাম প্রতিদিন চারশত বার এর থেকে পানাহ চায়। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এতে কারা প্রবেশ করবে? তিনি উত্তর দিলেন–

ওই সব ইবাদতকারী অথবা কুরআন পাঠকারী, যারা অন্যদেরকে দেখানোর জন্য নেক আমল করে। (তিরমিযী)

জাহান্নামের এ দুঃখ কূপে যাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুররা শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ বেশি ইবাদতকারীও হতে পারে এবং কুরআনের ইলম ও কুরআন পাঠ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী লোকও হতে পারে। তাই রাসূল (সা.)-এর বাণীর মর্ম এই যে, জাহান্নামের এ বিশেষ কূপ ও পরিখায় তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে, যারা দৃশ্যত উচুস্তরের দ্বীনদার, কুরআনের ইলমের সম্পদে সম্পদশালী এবং বড়ই ইবাদতকারী। কিন্তু বাস্তবে এবং অভ্যন্তর বিবেচনায় তাদের এ সকল দ্বীনদারী ও ইবাদত-বন্দেগী হবে রিয়াসুলভ।

নেক আমলের কারণে মানুষের কাছে সুনাম হয়ে যাওয়া আল্লাহর একটি নিয়ামত :

عن ابى ذر قال قال لرسول الله ﷺ ارايت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه وفى رواية ويحبه الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن (رواه مسلم)

হযরত আবু যর গেফারী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আপনি ওই ব্যক্তি সম্পর্কে কী বলেন, যেকোনো নেক আমল করে এবং লোকজন এ কারণে তার প্রশংসা করে- অন্য বর্ণনায় কথাটি এভাবে এসেছে যে, লোকজন এ কারণে তাকে ভালোবাসে। তিনি উত্তর দিলেন : এটা হচ্ছে মুমিন বান্দার নগদ সুসংবাদ (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : রিয়া এবং প্রসিদ্ধি লাভের আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উল্লিখিত বাণীসমূহে সাহাবায়ে কেরামকে এমন শংকিত করে ফেলেছিল যে, তাদের কারো কারো অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি হতে লাগল যে, যে নেক আমলের কারণে দুনিয়ার মানুষ আমলকারীর প্রশংসা করে এবং তার নেক আমলের আলোচনা হয়, আর লোকজন তাকে আল্লাহর নেক বান্দা মনে করে তাকে ভালোবাসতে শুরু করে হয়তো ওই নেক আমলও আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না। কেননা এ আমলকারী তো দুনিয়াতেই সুনাম ও ভালোবাসার পুরস্কার লাভ করে নিল। এ ব্যাপারেই রাসূলুল্লাহ (সা.) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, যার উত্তরে তিনি বলেছেন, এটা হচ্ছে মুমিন বান্দার নগদ সুসংবাদ।

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা
শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর
অমূল্য বাণী

উস্তাদদের পরস্পর আচরণ কেমন হওয়া উচিত :

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

انما المومنون اخوة

মুসলমান তো সবাই ভাই।

এক মুমিন অন্য মুমিনের ভাই। মাদরাসার শিক্ষকগণের মধ্যে এই ভ্রাতৃত্ব আরো বেশি হওয়া উচিত। তাই পরস্পর হিতাকাঙ্ক্ষীর আচরণ করতে হবে। বয়সে বড়দেরকে বড় ভাইয়ের মতো শ্রদ্ধা করতে হবে। ছোটদের সাথে অত্যন্ত স্নেহ ও শফকতের আচরণ করতে হবে। হুকুকুল ইসলাম নামে হযরত থানভী (রহ.)-এর একটি কিতাব আছে। সেখানে বড় ও ছোটদের পরস্পর প্রাপ্য ও হক কী কী, লেখা আছে। উক্ত কিতাব পড়ে সে মতে পরস্পরের সাথে আচরণ করবেন। ছোটদের ব্যাপারে বড়াদের ধারণা এমন হওয়া উচিত, তারা ছোট তাই তাদের গোনাহও কম। বড়দের ব্যাপারে ছোটদের ধারণা হতে হবে, তাদের বয়স বেশি তাই তাদের নেক আমলও বেশি এবং তাদের অভিজ্ঞতাও অধিক। সাথে সাথে পরস্পরের প্রতি ভালো ধারণা রাখতে হবে।

এই সুন্নাতের ওপর আমল হওয়া উচিত :

ছাত্রদের সাথে আচরণে স্নেহের প্রাধান্য প্রয়োজন। যথাসম্ভব তাদের প্রহার না করে বুঝিয়ে-সুজিয়ে রাখা উচিত। বর্তমানে যারা পড়াপড়িতে আছেন, তাদের বেশির ভাগেরই বুজুর্গানে দ্বীনের সাথে সম্পর্ক নেই। তারা আত্মশুদ্ধিকৃত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন। যার কারণে ছাত্রদের মারধর করার ক্ষেত্রে তাদের নফস সংযত হয় না। বরং নিজেদের রাগের সময় সীমারেখার দিকেও খেয়াল করা হয় না। হাসপাতালসমূহে সব ডাক্তার অপারেশনের কাজ করে না। বরং অপারেশনের জন্য কিছু নির্দিষ্ট ডাক্তার আছে। বেশির ভাগ ডাক্তার মেডিসিনেরই হয়ে থাকে। ছাত্রদের মারার ব্যাপারটিও সেরূপ। এটিও এক ধরনের অপারেশন। সুতরাং সবার জন্য এই কাজ নয়।

ছাত্রদের মারধর না করাও সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আনস (রা.) রাসূল (সা.)-এর খাদেম ছিলেন। রাসূল (সা.)-এর কাছে দশ বছর যাবত শিক্ষা অর্জন করেন। তাঁর সাথে রাসূল (সা.)-এর আচরণ কেমন ছিল? ভালোবাসা ও স্নেহপূর্ণ ছিল। সুতরাং এই সুন্নাতের ওপরও আমল হওয়া উচিত।

নিজের যোগ্যতাকে কাজে লাগান :

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এমন যোগ্যতা আছে, যা কাজে লাগালে কামিয়াব ও সফল হতে পারে। এই যোগ্যতাকে কাজে না লাগালে সে কামিয়াব হয় না। এ কারণেই অনেক ঘরানার লোক খুব দিনদার ও সৎ হন। কিন্তু তাদের ছেলেসন্তান তাদের মতো হয় না। পিতা হাফেজ, কিন্তু ছেলে হেফজ করতে পারে না। পিতা আলেম, কিন্তু ছেলেসন্তান আলেম হতে পারে না। এর কারণ হলো, যোগ্যতা অনুসারে কাজ নেওয়া হয়নি। কিছু আলেমের ছেলে নিম্নমানের পেশা গ্রহণ করে থাকে। আবার একজন রিকশাচালকের ছেলে দারুল হাদীসে বসে হাদীসের দরস দিয়ে থাকে। এর কারণ হলো, আলেমের সন্তান জাহেলের পন্থা অবলম্বন করে নিষ্ফল হয়েছে। জাহেলের সন্তান আলেমের পথ অবলম্বন করে সফল হয়েছে। মূল কথা হলো, যে যোগ্যতা ও মেধা বিদ্যমান তা কাজে লাগালে মানুষ কামিয়াব হয়ে যায়। নিজের শিক্ষকবৃন্দ, মাতা-পিতা এবং প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্তগণকে নিজের হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করো, তাদের দিকনির্দেশনা মতেই কাজ করো। তখন বিকাশ ও উন্নতির ধারা অব্যাহত থাকবে।

আল্লাহর মহব্বতে উন্নতি করার পন্থা :

প্রত্যেক দ্বীনি ও নেককাজে আল্লাহর মহব্বতের উন্নতির নিয়্যাত করবে। ওজু, যিকির, তিলাওয়াত ইত্যাদি আমল করার সময় নিয়্যাত করো, এর মাধ্যমে আল্লাহর মহব্বতে উন্নতি হোক। তখন ইনশাআল্লাহ আল্লাহর মহব্বতে উন্নতি হতে থাকবে।

সফরের জন্য দুটি বস্তু জরুরি :

সফরের জন্য দুটি বস্তু আবশ্যক। একটি টিকিট। অপরটি হলো পাথেয়। যদি টিকিট থাকে কিন্তু পাথেয়র ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সফর হয়ে যাবে; কিন্তু কষ্টসাধ্য হবে। স্তরে স্তরে দুঃখ-কষ্টের সীমা থাকবে না। আখেরাতের সফরেরও একই অবস্থা। ঈমান হলো টিকিট আর নেক আমল হলো এর পাথেয়। উভয়টিই মানুষের কাছে থাকা আবশ্যক। যদি ঈমানের টিকিট আছে কিন্তু নেক আমলের পাথেয় নেই, তখন দীর্ঘ কষ্ট ও মুশাক্কাতের কঠিন মুহূর্ত অতিক্রম করেই জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে।

মাওয়ায়েযে

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা, ঢাকায় সম্প্রতি ছাত্রদের উদ্দেশে দেওয়া বয়ান

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

সবার চোখে ঘুম-ঘুম ভাব। সবার নিদ্রাতুর আঁখি থেকে বোঝা যাচ্ছে, সবাই অধিক ইবাদতে ক্লান্ত-শ্রান্ত। আমরা উচ্চমানের কাজগুলোতে প্রায় ঘুমিয়ে পড়ি। নামাযে আমাদের ঘুম আসে। একদিকে হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ দরস চলছে, অন্যদিকে ছাত্ররা নিদ্রাবিষ্ট। শুধু দুটি কাজে আমরা ঘুমাই না। ১. খাওয়ার সময়। ২. বাজে গল্পের সময়। হ্যাঁ, যেসব ক্লাসে আজেবাজে পড়ানো হয়, সেসব ক্লাসেও সাধারণত ছাত্রদেরকে ঘুমাতে দেখা যায় না। এর অর্থ হচ্ছে, উচ্চমানের কাজের সময় আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। আর নিম্নমানের কাজের সময় আমাদের খুব একটা ঘুম আসে না। যা হোক, সবাই একটু নড়েচড়ে বসুন! যাতে নিদ্রাকর্ষণ বিদূরিত হয়ে যায়।

শিক্ষামন্ত্রীর বাস্তবতা উপলব্ধি :

গতকাল একজন আমাকে জানাল, আমাদের শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় দিনাজপুরে আলিয়া মাদরাসার শিক্ষকদের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে একটি বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, আপনাদের যোগ্য মানুষ তৈরি করতে হবে, যারা নিজেরা আলোকিত হবে এবং সমাজকেও নিজেদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোয় দীপান্বিত করবে। আর তার একমাত্র পথ হচ্ছে, কুরআন-হাদীস এবং ফিক্বাহ। এই তিনটিই হচ্ছে মানুষ তৈরির মূল। এই কথা শুনে আমি মনে মনে হাসি। আর বলি, মাননীয় মন্ত্রী মনে হয় গত মাসের 'মাসিক আল-আবরার' পড়েছেন কারণ সেখানেও ছবক উদ্বোধনের দিন প্রদত্ত বয়ানে একই কথা বলা হয়েছে। যা হোক, মন্ত্রীর এই বাস্তবতা উপলব্ধিতে আমরা মন্ত্রী মহোদয়কে সাধুবাদ জানাচ্ছি। সত্য এবং বাস্তব কথা যেই বলুক না, তার প্রতি আমাদের সমর্থন থাকবে ইনশাআল্লাহ।

আলিয়ার নেসাব এবং আমি... :

কিছুক্ষণ পূর্বে এক পত্রিকার সাংবাদিক আমার সাথে কথা বলে। সে নিজেকে ওই পত্রিকার সিনিয়র রিপোর্টার হিসেবে পরিচয় দেয়। জিজ্ঞেস করলাম, আমি আপনার কী সাহায্য করতে পারি? সে বলল, বর্তমান সরকার আলিয়া মাদরাসার শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে। এ বিষয়ে আমরা আপনার মতামত জানতে চাচ্ছি। প্রত্যুত্তরে বললাম, ভাই, আমার জীবদ্দশায় কোনো দিন আলিয়ার পথও মাড়ায়নি। সুতরাং তাদের পাঠ্যক্রম সম্পর্কে আমার ন্যূনতম ধারণা নেই। সে বলল, তাহলে আমি সেখান থেকে আপনাকে কিছু পড়ে শোনাই? আমি বললাম, প্রয়োজন নেই। এই বলে মোবাইলের লাইন কেটে দিলাম। ব্যস, ঘটনা মাত্র এত দূর। কিন্তু আল্লাহই জানেন, এটাকে টেনেটুনে কতদূর করা হয়। পরে নেসাব পরিবর্তন সম্পর্কে যা শুনলাম, তার সারনির্যাস হচ্ছে, বর্তমান সরকারের আমলে আলিয়ার নেসাবে কিছু কিছু বেরলভী আক্বীদা-বিশ্বাস ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন গত জোট সরকারের আমলে সেখানে মওদূদীর আক্বীদা-দর্শনের অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছিল। এ বিষয়ে আমরা কী বলব? জোট সরকারের সময়কার কাজটি যেমন নিন্দিত ছিল, তেমনি বর্তমান সরকারের এই পদক্ষেপটিও সমানভাবে ঘৃণিত এবং অগ্রহণযোগ্য।

মারকায এবং অন্য প্রতিষ্ঠানের মাঝে মৌলিক ব্যবধান :

বাংলাদেশের অন্যান্য কওমী প্রতিষ্ঠান এবং আমাদের মারকাযের মাঝে খুব একটা পার্থক্য নেই। সামান্য একটা পার্থক্য আছে। সেটা হলো, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে শুরু থেকে লেখাপড়া করানো হয়। ফলে সেখানে হাজার-হাজার ছাত্র। আর আমাদের মারকাযে শুধুমাত্র তাখাসসুছাত এবং দাওরা-মিশকাত রয়েছে। ফলে ছাত্রসংখ্যা একটু কম। কিন্তু এখানে যা আছে, তাও অনেক বেশি। আমার খেয়াল ছিল, শুধুমাত্র একশত জন ছাত্র হলেই যথেষ্ট হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, আরেকটি মৌলিক পার্থক্য আছে, সেটা হলো, বাংলাদেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র শিক্ষার প্রতি জোর দেওয়া হয় বেশি, তারবিয়্যাতের প্রতি কম। আর মারকাযে শিক্ষার পাশাপাশি তারবিয়্যাতেরও সমান গুরুত্ব রয়েছে। ইলম-আমলের সমন্বয়, তালীম-তারবিয়্যাতের সমান গুরুত্ব, এটা মারকাযের অনন্য বৈশিষ্ট্য। আমরা এখানে অনেক কাজ করি, যেগুলো নিজেদের জন্য উপকারী, আবার অনেক কাজ জনগণের জন্য করে থাকি।

যেমন প্রতিদিন প্রত্যুষে আমরা 'সূরা ইয়াসীন' পাঠ করে থাকি। এটা নিজেদের জন্য। কারণ হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি প্রত্যুষে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, মহান আল্লাহ ওই দিনে তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। এমনিভাবে 'সূরা ওয়াকিয়াহ' পাঠ করে থাকি। কারণ সূরা ওয়াকিয়াহ পাঠ করলে অভাব-অনটন তাকে স্পর্শ করতে পারে না। এগুলো হচ্ছে নিজেদের জন্য। আবার সাধারণ মুসলমানদের জন্যও কাজ করে থাকি। যেমন অনেকেই খতমে বোখারী পড়ান, খতমে কুরআন পড়ান। আমাদের ওপর তাদের অবিচল আস্থা এবং প্রবল বিশ্বাস আছে বলেই তারা আমাদের কাছে এসব

পড়িয়ে দু'আর জন্য আসেন। তাই আমাদেরকে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে খতমে বোখারী পড়া উচিত। খতমে কুরআনেও সমান গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে যদি আমরা অবহেলা এবং অমনোযোগিতা প্রদর্শন করি, তাহলে সর্বপ্রথম আমরা নিজেদের পায়ে কুড়াল মারলাম এবং স্বইচ্ছায় ওই ভাইদের ক্ষতি করলাম।

খতমে জালালী : কেন এবং কিভাবে পড়তে হয়?

এখন মারকাযে শুরু হয়েছে খতমে জালালী। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি ইসমে আজমের উসিলা দিয়ে দু'আ করবে, তার দু'আ কখনো প্রত্যাখ্যাত হবে না। তবে ইসমে আজম কোন শব্দে নিহিত, তা নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ এবং প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে, ইসমে আজম হলো আল্লাহ শব্দটি। খতমে জালালীতে এই আল্লাহ শব্দটিকে এক লক্ষ বিশ হাজার বার জা'ফরানের কালি দিয়ে লেখা হয়। একটা খতমে জালালীর জন্য কত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়? নতুন কলম, নতুন কার্পেট, জা'ফরানের কালি, নতুন কাগজ, অর্থাৎ সব কিছু ঝকঝকে তকতকে। এত আয়োজন কেন করা হয়? একমাত্র ইসমে আজম আল্লাহ শব্দের মাহাত্ম্য এবং বড়ত্বের প্রতি লক্ষ করে।

ইমাম সিবওয়াই (রহ.)-এর ঘটনা :

আল্লাহ শব্দটি নিয়ে একটি জনশ্রুতি রয়েছে। ঘটনার নায়ক নাহু শাস্ত্রের পুরোধা ব্যক্তিত্ব ইমাম সিবওয়াই (রহ.)। ঘটনার সত্য-মিথ্যা আল্লাহ ভালো জানেন। ঘটনাটি হলো, নাহুবিদদের মাঝে এ ব্যাপারে বিরাট মতানৈক্য রয়েছে যে, ইসমের (সর্বনাম) ক্ষেত্রে আ'রাফুল মা'আরিফ কোনটি! বিভিন্ন মত থাকলেও ইমাম সিবওয়াই (রহ.)-এর মত হচ্ছে, আল্লাহ শব্দটিই আ'রাফুল মা'আরিফ। তার মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, আমি আল্লাহ শব্দটিকে আ'রাফুল মা'আরিফ বলার কারণে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ!

হযরত সুলাইমান (আ.)-এর এক সঙ্গীর ঘটনা :

পবিত্র কুরআনে এ ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবৃত হয়েছে। হযরত সুলায়মান (আ.) যখন বিলকীসের সিংহাসন তার দরবারে উপস্থিত করতে মনস্থ করলেন, তখন তার সভা সদস্যের মধ্য থেকে এক জীন বলল, আপনি এই স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই আমি তা আপনার সামনে উপস্থিত করব। এ তো অনেক সময়। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর যে আরো দ্রুত দরকার। তখন আরেকজন বললেন, আপনার চোখের পলক পড়ার পূর্বেই আমি তা দরবারে উপস্থিত করব এবং তিনি তা করে দেখিয়েছেনও। এটা সম্ভব হলো কিভাবে? এটা সম্ভব হয়েছিল ইসমে আজম আল্লাহ শব্দের বরকত এবং শক্তিতে। দেখুন আল্লাহ শব্দে কত বরকত! তাই যারা আল্লাহ শব্দ লিখবে, যারা কাটবে, যারা আল্লাহ শব্দটিকে গলির ভেতর ভরবে এবং যারা নদীতে তা নিক্ষেপ করবে, সবার খুব সতর্কতা এবং গুরুত্বের সাথে কাজগুলো আঞ্জাম দেওয়া দরকার। পাছে কোনো অসতর্কতা এবং বেআদবির যেন নিজের জীবনের ধ্বংস ডেকে নিয়ে না আসে। যারা খতমে জালালীতে অংশ নিয়েছো। সম্ভব হলে নতুন পাঞ্জাবি-পায়জামা অথবা লুঙ্গি পরিধান করে আসবে। তা যদি কষ্টসাধ্য হয়, তাহলে ধোলাইকৃত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করে আসবে। হাতে কাজ থাকবে, মুখে থাকবে দু'আয়ে ইউনুস-

لااله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين

কেউ কেউ এই দু'আটিকে ইসমে আজম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

ছাত্রদের পোশাক-পরিচ্ছদ :

অনেকের মাথায় বিভিন্ন ধরনের টুপি দেখা যাচ্ছে। অথচ আমি বছরের শুরুতেই বলেছিলাম, যে টুপি মাথার সাথে লেপ্টে থাকে, এমন টুপি মাথায় দেওয়া সুন্নাত। কিন্তু তোমরা কয়জনে এই কথাটিকে গুরুত্বসহকারে নিয়েছো? বলেছিলাম, সবাইকে সাদা পাঞ্জাবি পরিধান করতে। কিন্তু এখনো অনেকের শরীরে রঙ-বেরঙের বাহারি কাপড় দেখা যাচ্ছে। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় কাপড় হচ্ছে সাদা, এই কথা তো সবার জানা থাকার কথা। কিন্তু সবাই এর ওপর আমল করতে পারছো না কেন? আর্থিক সমস্যা? আমার তো তা বিশ্বাস হয় না! কারণ মারকাযে যে দুটি দোকান রয়েছে, তাতে দৈনিক প্রায় ৭-৮ হাজার টাকা বেচাকেনা হয়। এর চেয়ে কম হলে তো তাদের পোষাবে না। মাসে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা লেনদেন হয়। এগুলো তো আর জীনরা করছে না, বরং তোমরাই করছো। সকালে নাস্তা দেওয়া হচ্ছে, দুপুরে ভালো খাবার দেওয়া হচ্ছে, রাতে উন্নতমানের খাবার দেওয়া হচ্ছে, তার পরও এত টাকা খরচ করার প্রয়োজনীয়তা আমার বুঝে আসে না। আমি খেতে নিষেধ করছি না, বরং খাও। কিন্তু সুন্নাতি জামা-টুপির কথা বললে কেন আর্থিক সমস্যার কথা আসবে? অযথা গাঁটের পয়সা ব্যয় না করে ভালো পথে ব্যয় করতে সচেষ্ট হও। আর চুলের ব্যাপারেও বাড়াবাড়ি দেখা যাচ্ছে। হয়তো মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলো, অথবা সমান করে কেটে ফেলো। বাবরী চুলের কথা হাদীসে থাকলেও আমাদের আকাবিররা ছাত্রদের জন্য তার অনুমতি দেননি। তাই তা রাখা যাবে না। কোনো শিক্ষক যদি রাখতে চান, তাহলে এর জন্য অবশ্যই অনুমতি আছে। সুন্নাত মতে চলতে চেষ্টা করো তাহলে ইনশাআল্লাহ তোমাদের ইলম আমলে নূর সৃষ্টি হবে এবং ভবিষ্যৎ জীবন উজ্জ্বল হবে। আল্লাহ সবাইকে তাঁর মর্জিমতো চলার তাওফীক দান করুন। আমীন!

'সিরাতে মুস্তাকীম' বা সরল পথ

নির্ধারিত এক মাযহাবের তাকলীদ ও অতীতের উলামায়ে কেরাম

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

২৪১ হিজরীতে ইমাম আহমদ (রহ.)-এর ইন্তিকালের পূর্বেই চার মাযহাব সংকলিত হয়ে যায়। চার মাযহাব ছড়িয়ে পড়ার পর পৃথিবীর বুকে যত উলামায়ে কেরামের আগমন ঘটেছে, তাঁরা সকলেই কোনো না কোনো মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তবে যাঁরা নিজেকে মুজতাহিদ মনে করতেন, তাঁদের কথা ভিন্ন। অনেকে বলে থাকে, নির্ধারিত কোনো মাযহাবের তাকলীদ শুরু হয় হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে। তাদের কথা ঠিক নয়। কারণ ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন :

والاوزاعى امام اهل الشام وقد كانوا على مذهبه الى المائة الرابعة

'আওযায়ী (রহ.) সিরিয়াবাসীর ইমাম ছিল, চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত সিরিয়াবাসীরা তাঁর মাযহাব অনুসরণ করত।' (মাজমূআতুল ফাতাওয়া : ২০/৫৮৩)

ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেছেন :

كان أهل الشام ثم أهل الأندلس على مذهب الأوزاعى مدة من الدهر، ثم فنى العارفون به وبقى منه ما يوجد فى كتب الخلاف.

'বেশ কিছুদিন সিরিয়া ও স্পেনের অধিবাসীরা আওযায়ী (রহ.)-এর মাযহাবের অনুসারী ছিল। অতঃপর একসময় তাঁর মাযহাবের আলেমগণ নিঃশেষ হয়ে যায়, (এতে করে তাঁর মাযহাবও হারিয়ে যায়, যেহেতু তাঁর মাযহাব সংকলিত হয়নি) এখন তাঁর মাযহাবের কিছু অংশ 'কুতুবুল খেলাফ' (এমন কিতাবসমূহ, যার মধ্যে বিভিন্ন মাযহাবের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে)-এর মধ্যে পাওয়া যায়।' (তাযকিরাতুল হুফ্ফায : ১/১৩৪ শামেলা)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও ইমাম যাহাবী (রহ.)-এর বক্তব্য দ্বারা এ কথা স্পষ্টই বুঝে আসে হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর আগেও বিভিন্ন এলাকায় নির্দিষ্ট ইমামের তাকলীদ করা হতো। কারণ ইমাম আওযায়ী (রহ.) হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর ইমাম ছিলেন। তিনি ১৫৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

সারকথা এই যে, চার মাযহাব যখন থেকে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং ছড়িয়ে পড়ে তখন থেকে কুরআন-হাদীস ও ফিকহ সম্পর্কে যত বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরাম পৃথিবীর বুকে আগমণ করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই চার মাযহাবের যেকোনো এক মাযহাব অনুসরণ করেছেন। তবে ইমামের দলিলের চেয়ে শক্তিশালী দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে কিছু মাসআলায় তাঁরা নিজ অনুসৃত ইমামের মতের বিরোধিতাও করেছেন। এখানে উম্মাতের বড় বড় কয়েকজন আলেমের নাম উল্লেখ করছি, যাঁরা কুরআন-হাদীস ও উলূমুল হাদীস সম্পর্কে বিশেষ পারদর্শিতা সত্ত্বেও নিজের বুঝমতো না চলে নির্দিষ্টভাবে কোনো একজন ইমামকে মেনে চলেছেন।

১. ইমাম দারাকুতনী ২. ইমাম বাইহাকী ৩. ইমাম ইবনে আব্দুল বার ৩. ইমাম মুনযিরী ৪. ইমাম ত্বহাবী ৫. ইমাম খত্তাবী ৬. ইমাম নববী ৭. কাযী ইয়ায ৮. ইমাম যাহাবী ৯. ইমাম যাইলায়ী ১০. তকীউদ্দীন সুবকী ১১. ইবনে রজব হাম্বলী ১২. ইমাম যাইনুদ্দীন ইরাকী ১৩. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী ১৪. ইমাম ইবনে কাসীর ১৫. খতীবে বাগদাদী ১৬. ইবনুল মুনযির ১৭. ইমাম আবূ দাউদ ১৮. ইমাম নাসাঈ ১৯. ইমাম রামাহুরমুযী ২০. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী ২১. ইমাম সাখাবী ২২. ইমাম ইবনে আব্দুল হাদী ২৩. ইমাম ইবনুল জাওযী ২৪. ইমাম জামালুদ্দীন মিয্যী ২৫. ইমাম ইবনে মান্দাহ রহিমাহুমুল্লাহ।

এখানে উদাহরণস্বরূপ মাত্র পঁচিশ জনের নাম উল্লেখ করা হলো। যাঁরা বিজ্ঞ হাদীস বিশারদ হওয়া সত্ত্বেও নির্দিষ্ট এক মাযহাব মেনে চলেছেন। বর্তমান লা-মাযহাবী বন্ধুদের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, তাঁরা এসব বড় বড় হাদীস বিশারদ ইমামদের থেকেও নিজেদের বেশি জ্ঞানী মনে করেন, তাই তো তাঁরা কোনো নির্দিষ্ট ইমামকে না মেনে নিজেদের বুঝ অনুযায়ী চলছেন এবং অন্যদেরকেও তাঁদের মতামত গ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহিত করছেন। উল্লিখিত বড় বড় ইমামের চেয়ে নিজেদের বেশি জ্ঞানী মনে করা আসলে বুদ্ধিমানের কাজ নয়, বোকামি? এর বিচারের ভার পাঠকের ওপর ছেড়ে দিলাম।

তাকলীদ না করার পক্ষে যাদের কথা দলিল হিসেবে পেশ করা হয়ে থাকে :

আমাদের লা-মাযহাবী বন্ধুরা অতীতের কায়েকজন আলেমের উক্তির অসদ্ব্যবহার করে কারো তাকলীদ করাকে নাজায়েয ও শিরক প্রমাণ করতে চান। তাঁরা

সাধারণত যে কয়জন উলামায়ে কেরামের উক্তিকে নিজেদের পক্ষে উল্লেখ করে থাকেন তাঁরা বাস্তবেই ওই কথা বলেছেন কি না বা বলে থাকলেও কার জন্য কোন প্রেক্ষাপটে বলেছেন, তা আমরা যাচাই করে দেখার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

তাঁরা সবচেয়ে বেশি যাঁর কথা উল্লেখ করেন তিনি হলেন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)। অথচ তাকলীদ জায়েয হওয়ার পক্ষে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এত উক্তি করেছেন যে, তা যদি একত্রিত করা হয়, তাহলে একটি রেসালা (পুস্তক) হয়ে যাবে। আমরা তাকলীদ বৈধ হওয়ার পক্ষে তাঁর কয়েকটি উক্তি উল্লেখ করছি :

والذى عليه جماهير الامة ان الاجتهاد جائز فى الجملة والتقليد جائزفى الجملة ...والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد.

'উম্মাতের অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতামত হলো বাস্তবে ইজতিহাদ করা জায়েয আর তাকলীদ করাও জায়েয... যে ব্যক্তি ইজতিহাদ করতে পারে না তার জন্য তাকলীদ করা বৈধ।' (মাজমূআতুল ফাতাওয়া : ২০/২০৩)

ইবনে তাইমিয়া (রহ.) আরো বলেন :

من كان عاجزا عن معرفة حكم الله ورسوله وقد اتبع فيها من هو من اهل العلم والدين ولم يتبين له ان قول غيره ارجح منه فهو محمود يثاب لايذم على ذالك ولايعاقب.

'যে ব্যক্তি সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম-আহকাম জানতে অক্ষম, সে যদি এ ক্ষেত্রে দ্বীনদার কোনো আলেম (মুজতাহিদ)-এর অনুসরণ করে এবং তার পক্ষে এটা জানা সম্ভব না হয় যে, অন্য ইমামের উক্তি তার অনুসরণীয় ইমামের উক্তির চেয়ে প্রাধান্যপ্রাপ্ত, তবুও সে প্রশংসার যোগ্য এবং সে সাওয়াবের অধিকারী হবে, এই তাকলীদের জন্য তাকে তিরস্কার করা যাবে না এবং আখেরাতেও সে শাস্তিযোগ্য সাব্যস্ত হবে না।' (মাজমূআতুল ফাতাওয়া : ২০/২২৫)

ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর এই উক্তি দ্বারা এ কথা পরিষ্কার বুঝে আসে যে, যে ব্যক্তি সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকে হুকুম-আহকাম উদ্‌ঘাটন করতে অক্ষম তার জন্য উচিত হলো দ্বীনদার কোনো মুজতাহিদের তাকলীদ করা। আর এ কথা স্পষ্ট যে, বর্তমান পৃথিবীর হাতেগোনা কয়েকজন বড় বড় আলেম ছাড়া সবার অবস্থাই এমন যে, তারা সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকে হুকুম-আহকাম উদ্‌ঘাটন করার যোগ্যতা রাখে না। তাই ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর উক্তি অনুযায়ী বর্তমান পৃথিবীর সমস্ত মুসলিমেরই উচিত কোনো না কোনো মাযহাবের তাকলীদ করা।

ইবনে তাইমিয়া (রহ.) আরো বলেন :

المقلد يقلد السلف اذ القرون المتقدمة افضل مما بعدها.

'যারা তাকলীদ করবে তাদের জন্য উচিত হলো সালাফে সালেহীনের তাকলীদ করা। কারণ পূর্বের শতাব্দী পরবর্তী শতাব্দী থেকে উত্তম।' (মাজমূআতুল ফাতাওয়া : ২০/৯)

ইবনে তাইমিয়া (রহ.) আরো বলেন :

مسائل الاجتهاد من عمل فيه بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر واذا كان فى المسألة قولان فان كان الانسان يظهر له رجحان احد القولين عمل به والا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم .

'ইজতিহাদী মাসায়েলের মধ্যে যদি কেউ কোনো আলেম (মুজতাহিদ)-এর উক্তি অনুযায়ী আমল করে, তাহলে তাকে কোনো দোষ দেওয়া যাবে না এবং তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। যদি কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে দুই ধরনের উক্তি থাকে আর সে যদি এমন হয় যে, তার কাছে কোনো এক উক্তি (দলিলের বিবেচনায়) প্রাধান্য পায়, তাহলে সে সে অনুযায়ী আমল করবে, অন্যথায় যে আলেমের ওপর তার আস্থা হয় তার তাকলীদ (অনুসরণ) করবে।' (মাজমূআতুল ফাতাওয়া : ২০/২০৭)

ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর উপরিউক্ত উক্তিসমূহের সারকথা এই যে, তিনি এমন যোগ্যতাসম্পন্ন আলেমকে তাকলীদ করতে নিষেধ করেছেন, যে নিজেই কুরআন-সুন্নাহ ঘেঁটে পূর্ববর্তী ইমামদের উক্তির মধ্যে থেকে রাজেহ মারজূহ নির্ণয় করতে পারে। আর যার এমন যোগ্যতা নেই তাকে তিনি তাকলীদ করতে বলেছেন। অতএব, ব্যাপাকভাবে এ কথা বলা যে, ইমাম ইবনে তাইমিয়া তাকলীদকে নাজায়েয বলেছেন, তা তার ওপর অপবাদ বৈ কিছু নয়।

ইবনুল কাইয়্যিম ও তাকলীদ :

আহলে হাদীস ভাইয়েরা তাকলীদ করা যাবে না মর্মে ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)-এর উক্তি বেশ জোশের সাথে উল্লেখ করে থাকে। অথচ তাকলীদ সম্পর্কে ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)-এর অবস্থান পরিষ্কার নয়। কারণ তিনি 'ই'লামুল মুআক্কিয়ীন'-এ তাকলীদ সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী কথা বলেছেন। তাকলীদ আলোচনার শুরুতেই তিনি বলেন :

ذكر تفصيل القول فى التقليد .وانقسامه الى ما يحرم القول فيه والافتاء به والى ما

المقلد ان كان يعرف ما انزل الله على رسوله فهو مهتد وليس بمقلد وان كان لم يعرف ما انزل الله على رسوله فهو جاهل ضال باقراره على نفسه .اعلام الموقعين:٢/١٧٠

এখানে তিনি তাকলীদ ও মুকাল্লিদদের সমালোচনায় এত নিমগ্ন হয়ে গেছেন যে, ইতিপূর্বে ওয়াজিব ও জায়েয তাকলীদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবেন বলে যে ওয়াদা তিনি করেছিলেন, তাও বেমালুম ভুলে গেছেন। এই দীর্ঘ প্রায় ৯০ পৃষ্ঠার আলোচনায় তিনি ওয়াজিব ও জায়েয তাকলীদ সম্পর্কে কোনো আলোচনাই আর করেননি।

তাকলীদ সম্পর্কে ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)-এর আলোচনা মনোযোগসহ যে-ই অধ্যায়ন করবে, তার জন্য এই ফলাফলে পৌঁছা কষ্টকর হবে না যে, তাকলীদ সম্পর্কে ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)-এর মতামত অসম্পূর্ণ ও পরস্পরবিরোধী। কোনো আলেমের অসম্পূর্ণ ও পরস্পরবিরোধী মতামতকে নিজেদের পক্ষের বড় দলিল মনে করা চরম মুর্খতা ছাড়া আর কী হতে পারে! অবশ্য তার কথা দ্বারা এতটুকু প্রমাণিত হয়েছে যে, তার মতে তাকলীদের এমন একটি প্রকার আছে, যা জায়েয আর এমন একটি প্রকারও আছে, যা ওয়াজিব। কিন্তু তিনি মুকাল্লিদদের দোষ বর্ণনা করতে গিয়ে সেগুলোর আলোচনা ভুলে গেছেন।

শায়েখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব ও তাকলীদ :

আহলে হাদীস ভাইদের কাছে তাকলীদ না করার ব্যাপারে আরেকজন মান্যবর ব্যক্তি হলেন শায়েখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব (রহ.)। তাকলীদ করা যাবে না মর্মে তারা মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব

ومأجور غيرمأزور كما سيأتى بيانه عند ذكر التقليد الواجب والسائغ ان شاء الله.

'আল্লাহ তা'আলা যা নাযিল করেছেন তা অনুসরণ করার ব্যাপারে যে ব্যক্তি নিজ সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করে, আর যে বিষয়গুলো নিজে বুঝতে পারে না সে বিষয়ে তার চেয়ে বেশি জাননেওয়ালা কারো তাকলীদ করে, তাহলে সে প্রশংসনীয় কাজ করল তাকে তিরস্কার করা হবে না, সে সাওয়াব পাবে, গুনাহ হবে না। এর বিস্তারিত বর্ণনা ওয়াজিব ও জায়েয তাকলীদের আলোচনায় আসছে।' (ই'লামুল মুআক্কিয়ীন : ২/১৬৯)

ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)-এর এই উক্তি মূলত ওই বড় আলেমের জন্য, যে নিজে নিজেই কুরআন-সুন্নাহ থেকে হুকুম আহকাম উদ্‌ঘাটন করতে পারে। যে অংশ তার বুঝে আসে না সে ক্ষেত্রে অন্য কোনো বড় আলেমের তাকলীদ করে।

আমাদের মতামতও এ ক্ষেত্রে ইবনুল কাইয়্যিমত থেকে ভিন্ন নয়। কারণ এমন আলেম যে সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকে হুকুম-আহকাম উদ্‌ঘাটন করতে পারে (যার মধ্যে এক ধরনের ইজতিহাদের যোগ্যতা এসে গেছে) তার জন্য আমরা নির্দিষ্ট কোনো ইমামের তাকলীদকে জরুরি বলি না।

এতটুকু পর্যন্ত ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) এর কথা ঠিক ছিল। কিন্তু এরপর তিনি ৮০-৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ আলোচনা করে সব ধরনের তাকলীদকে নাজায়েয ও হারাম প্রমাণের প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছেন। এমনকি এমন সাধারণ মুসলিম যে কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে কিছুই জানে না সেও যদি তাকলীদ করে তাকেও তিনি মুর্খ ও গোমরাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন :

يجب المصير اليه و الى مايسوغ من غير ايجاب.

'তাকলীদের বিস্তারিত আলোচনা : তাকলীদ কখনো হারাম, কখনো ওয়াজিব ও কখনো জায়েয হয়, এই তিন প্রকার তাকলীদের বর্ণনা।' (ই'লামুল মুআক্কিয়ীন : ২/১৬৮)

ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) উপরিউক্ত কথা দ্বারা বোঝা যায় যে, তাঁর মতে তাকলীদ তিন প্রকার : ১. এমন তাকলীদ, যা হারাম। হারাম তাকলীদের মধ্যে তিনি আলাদাভাবে তিন প্রকার তাকলীদকে উল্লেখ করেছেন : ক. আল্লাহ তা'আলার হুকুম থেকে বিমুখ হয়ে বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণ। খ. এমন ব্যক্তির তাকলীদ করা, যার সম্পর্কে জানা নেই যে, সে বাস্তবে তাকলীদের উপযুক্ত কি না? গ. দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে অনুসৃত ইমামের মতামত কোনো ক্ষেত্রে ভুল প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তার তাকলীদ করা।

এই তিন ধরনের তাকলীদকে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) হারাম বলেছেন। আমরাও এই তিন প্রকার তাকলীদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে তাঁর সাথে একমত। আমরাও বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণকে জায়েয বলি না, আর এমন ইমামের তাকলীদ আমরা করি না বা করতে বলি না, যার অবস্থা সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। আর ইমামের কোনো মতামত দলিল-প্রমাণের আলোকে ভুল প্রমাণিত হওয়ার পরও সেক্ষেত্রে আমরা তার তাকলীদ করাকে জায়েয মনে করি না। মোটকথা, ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)-এর এই মতামতের সাথে আমাদেরও কোনো বিরোধ নেই।

এই আলোচনার একটু পরে তিনি বলেন

واما تقليد من بذل جهده فى اتباع ما انزل الله وخفى عليه بعضه فقلد فيه من هو اعلم منه فهذا محمود غير مذموم

(রহ.)-এর উক্তিও দলিল হিসেবে পেশ করে থাকেন। অথচ আমাদের জানামতে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব নজদী (রহ.) চার মাযহাবের মধ্য থেকে কোনো মাযহাবের তাকলীদ করতে নিষেধ করেননি। বরং তিনি নিজে, তার ছেলে ও তার সিলসিলার (সালাফী সিলসিলার) অন্যান্য আলেমগণ সবাই ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

শায়েখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব তাঁর ওপর উত্থাপিত কিছু অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে বলেন :

منها قوله انى مبطل كتب المذاهب الاربعة وانى اقول ان الناس من ست مائة سنة ليسوا على شى ء وانى ادعى الاجتهاد وانى خارج عن التقليد ... جوابى عن هذه المسائل ان اقول : سبحانك هذا بهتان عظيم.

'সেসব অভিযোগের মধ্য থেকে কয়েকটি এই : আমি নাকি বলি ১. চার মাযহাবের কিতাবসমূহ বাতিল ২. হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে মুসলমানরা ভিত্তিহীন জিনিসের ওপর আমল করে আসছে ৩. আমি মুজতাহিদ হওয়ার দাবিদার, আমি তাকলীদ করি না। এসব অভিযোগের জবাবে আমি শুধু এতটুকুই বলব : আল্লাহর কসম এগুলো সবই আমার ওপর আরোপিত অপবাদ বৈ কিছু নয়।' (আররসাইলুশ শাখসিয়া : পৃ. ৪)

শায়েখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব (রহ.)-এর ছেলে শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ, যিনি নিজ পিতার মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন, তিন বলেন :

ونحن ايضا فى الفروع على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله ولا ننكر على من قلد احد الاربعة دون غيرهم لعدم ضبط مذاهب الغير.

'ফিকহী মাসায়েলের ক্ষেত্রে আমরা আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর তাকলীদ করি। আর যে ব্যক্তি চার মাযহাবের মধ্যে থেকে কোনো একটির তাকলীদ করে আমরা তার ওপর কোনো অভিযোগ করি না। তবে আমরা (চার মাযহাব ছাড়া) অন্য কোনো মাযহাবের ওপর চলতে দিই না কারণ, অন্য মাযহাব সংকলিত ও সংরক্ষিত নয়।' (আদ্দুরারুস সানিয়্যাহ ফিল আজবিবাতিন নাজদিয়্যাহ : ১/২২৭)

শায়েখ মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহাব (রহ.)-এর সিলসিলার একজন বড় আলেম ও দাঈ শায়েখ মুহাম্মাদ আল উসাইমীন (রহ.) তাকলীদের দুটি প্রকার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন :

احدهما ان يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد.

'তাকলীদের একটি প্রকার হলো; তাকলীদকারী এমন সাধারণ লোক হওয়া, যে নিজে নিজে (কুরআন-সুন্নাহ থেকে) হুকুম উদ্‌ঘাটন করতে পারে না, সে ক্ষেত্রে তার ফরয হলো তাকলীদ করা।' (আল উসূল মিন ইলমিল উসূল : পৃ. ৮৭)

সারকথা, নির্ভরযোগ্য সমস্ত উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, সাধারণ মুসলিমদের জন্য চার মাযহাবের যেকোনো এক মাযহাবের তাকলীদ করা জরুরি। তবে কুরআন-সুন্নাহর ওপর বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী আলেমের নিকট যদি তার অনুসৃত ইমামের কোনো বিশেষ মাসআলা নিজ তাহকীক অনুযায়ী কুরআন-সুন্নাহের অন্য কোনো দলিলের বিরোধী সাব্যস্ত হয়, সে ক্ষেত্রে তার জন্য ওই মাসআলার মধ্যে চার মাযহাবের মধ্য থেকে অন্য কোনো মাযহাব মানার এখতিয়ার থাকবে। বরং ইমামের মত নিশ্চিতভাবে ভুল প্রমাণিত হলে, তার জন্য ওই মাসআলায় নিজ তাহকীক অনুযায়ী অন্যমত গ্রহণ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

আমাদের আহলে হাদীস বন্ধুরা বাংলা বই থেকে দু-একটি হাদীসের অনুবাদ পড়ে নিজেকে কুরআন-সুন্নাহের ব্যাপারে বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী মনে করলে তাদেরকে কিছু বলার মতো ভাষা আমাদের নেই। আহলে হক উলামায়ে কেরাম ৫০-৬০ বছর ধরে লাগাতার কুরআন-সুন্নাহ অধ্যয়ন করার পরও নিজেকে ঐ স্তরের বিজ্ঞ আলেম মনে করতে সাহস পায় না, যাদের জন্য ক্ষেত্র বিশেষ ইমামের মতের বিরুদ্ধে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। অথচ আহলে হাদীস বন্ধুরা দু-চারটা হাদীস বা হাদীসের অনুবাদ মুখস্ত করে নিজেকে কেমন যেন সেই পর্যায়ের আলেম ভাবতে শুরু করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হেদায়াত দান করুন।

আহলে হাদীস বন্ধুরা যদিও তাকলীদ না করার দাবি করে, কিন্তু বাস্তবে তারা আহলে হাদীস পণ্ডিতদের তাকলীদ করে থাকে। কারণ, আহলে হাদীস পণ্ডিতরা যা বলে দেয় সাধারণ আহলে হাদীস ভাইয়েরা অন্ধের মতো তা-ই মুখস্ত করে বলে বেড়ায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে আহলে হাদীস ভাইয়েরা তাদের পণ্ডিতদের তাকলীদ করছে, আর আমরা হানাফীরা ইমাম আজম আবূ হানীফা (রহ.)-এর তাকলীদ করছি। সাধারণ আহলে হাদীস ভাইদের কাছে আমার প্রশ্ন, খাইরুল কুরুনের ইমাম, ইমাম আজম আবূ হানীফা (রহ.)-এর তাকলীদ করা উত্তম, নাকি বর্তমান যমানার স্কলার আহলে হাদীস পণ্ডিতদের তাকলীদ করা উত্তম? আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

কুরবানী

তাৎপর্য, ফযীলত ও প্রয়োজনীয় মাসায়েল

মুফতী শাহেদ রহমানী

জিলহজ মাস। হিজরী বর্ষের শেষ মাস। মহান আল্লাহ তা'আলা হিজরী বারো মাসের কোনো কোনোটিকে মহিমান্বিত করেছেন তাঁর প্রতি আনুগত্য ও এবাদতের জন্য। এর মধ্যে দু'টি মাস সবচেয়ে ফযীলতপূর্ণ ও মহিমান্বিত। একটি পবিত্র রমাজানুল মুবারক, অপরটি জিলহজ। এ মাসের প্রথম দশকের অনেক ফযীলত যেমন রয়েছে, তেমনিভাবে রয়েছে দুটি মহান এবাদতও। একটি হজ, অপরটি কুরবানী। হজসংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা গত সংখ্যায় করা হয়েছে। এ সংখ্যায় কুরবানী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হলো।

☆ জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের ফযীলত :

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, ইবাদতের জন্য জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন থেকে উত্তম আর কোনো সময় নেই।... (তিরমিযী ৭৫৭, আবু দাউদ ২৪৩৮...)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, ইবাদতের জন্য জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন থেকে উত্তম আর কোনো সময় নেই। এ সময় এক দিনের রোযা এক বছরের রোযার সমান এবং এক রাতের ইবাদত শবে কদরের ইবাদতের সমান ফযীলতপূর্ণ। (তিরমিযী ৭৫৮, ইবনে মাজাহ ১৭২৮)

পবিত্র কুরআন মজীদে সূরায়ে 'ওয়াল ফাজরি'তে আল্লাহ তা'আলা যে দশ রাতের কসম করেছেন, অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে সে দশ রাত হলো জিলহজ মাসের প্রথম দশ রাত। বিশেষ করে জিলহজের ৯ তারিখ রোযা রাখা অতীতের এক বছর এবং ভবিষ্যতের এক বছর গোনাহের কাফফারা হওয়ার জন্য যথেষ্ট এবং ঈদের রাতে বিনিদ্র যাপন বড় ফযীলত ও সওয়াবপূর্ণ।

☆ জিলহজের প্রথম দশ দিন চুল ও নখ না কাটা মুস্তাহাব

হযরত উম্মে সালামা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন–

জিলহজের চাঁদ দেখা গেলে তোমাদের যারা কুরবানী করার ইচ্ছা করেছো, তারা চুল এবং নখ কর্তন থেকে বিরত থাকবে। (মুসলিম হাদীস নং ৩৯/১৯৭৭)

আরেক বর্ণনায় আছে

অর্থাৎ "চুল এবং নখ কাটবে না।" (মুসলিম ৪০/১৯৭৭)

ঈদুল আজহার দিন করণীয় :

☆ মসজিদে রাত্রি যাপন করা :

হযরত নাফে' (রহ.) বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে উমর (রা.) ইদুল ফিতরের রাত্রে মসজিদে অবস্থান করতেন। অতঃপর প্রত্যুষে ফজরের নামায আদায় করে (ঈদগাহে) চলে যেতেন এবং নিজ গৃহে আসতেন না। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৩/৩০৯)

☆ মিসওয়াক করা :

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জন্য জুমু'আর দিনকে ঈদের দিনে পরিণত করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি জুমু'আর নামায আদায়ের জন্য মসজিদে আগমণ করবে সে যেন গোসল করে এবং সুগন্ধি থাকলে তা ব্যবহার করে এবং তোমাদের জন্য মিসওয়াক করা অপরিহার্য। (ইবনে মাজাহ হাদীস ১০৮৮)

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রা.) বলেন, ঈদের দিন মিসওয়াক করা সুন্নাত। (মুসান্নাফে আব্দুররাযযাক ৩/৩০৮)

☆ গোসল করা :

সাহাবী ফাকেহ ইবনে সাদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) দুই ঈদের দিন এবং আরাফার দিন গোসল করতেন। সাহাবী ফাকেহ নিজের পরিবার-পরিজনকে এই দিনগুলোতে গোসলের আদেশ দিতেন। (ইবনে মাজাহ ১৩০৬)

☆ ভালো কাপড় পরিধান করা :

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা.) ঈদের দিন লাল রঙের ডোরাকাটা চাদর পরিধান করতেন। (মু'জামুল আউসাত লিততাবারানী ৭৮২৪)

হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ তার পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) প্রত্যেক ঈদে (হিবরী) কালো রঙের ডোরাকাটা চাদর পরিধান করতেন। (আসসুনানুল কুবরা লিলবাইহাকী ৬৩৫৬)

☆ খুশবু লাগানো :

হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ সূত্রে তার পিতা থেকে বর্ণিত যে, হযরত আলী

(রা.) দুই ঈদের দিন সকাল সকাল গোসল করতেন। হযরত নাফে ইবনে উমর (রা.)-এর আমল একই রকম বর্ণনা করেছেন এবং সুগন্ধি ব্যবহারের কথাও উল্লেখ করেন। (মুসান্নাফে আব্দুর রজ্জাক ৩/৩০৯)

☆ ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে কিছু না খাওয়া :

হযরত বুরাইদা (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা.) ঈদুল ফিতরের দিন না খেয়ে ঈদগাহে যেতেন না এবং ঈদুল আজহার দিন ঈদের নামায না পড়ে খেতেন না। (তিরমিযী ৪৯৮)

☆ শরীয়তসম্মত আনন্দ ও খুশি প্রকাশ করা :

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, যে, একবার আবু বকর (রা.) আমাদের বাড়িতে এলেন। তখন আমার নিকট আনসারী দুজন আবৃত্তিকারী মেয়ে আবৃত্তি করছিল, যা আনসারগণ বুআস দিবসে আবৃত্তি করত। তিনি বলেন, মূলত তারা দুজন গায়িকা ছিল না। আবুবকর (রা.) এসব দেখে বললেন, রাসূলের ঘরে শয়তানি বাঁশি? ঘটনাটি ছিল ঈদের দিনের। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন, আবুবকর! প্রত্যেক জাতির একটা খুশির দিন আছে। আজকে আমাদের খুশির দিন। (বুখারী ৮৯৯)

☆ সকাল সকাল হেঁটে ঈদগাহের দিকে যাওয়া :

হযরত আলী ইবনে আবী তালেব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুন্নাত হলো ঈদগাহের দিকে হেঁটে যাওয়া এবং (ঈদুল ফিতরের দিন) বের হওয়ার আগে কিছু খাওয়া। (তিরমিযী ৪৮৭)

☆ ঈদের নামাযের পূর্বে ঘরে নফল নামায পড়া মকরুহ, তেমনি ঈদগাহেও নফল নামায পড়া মকরুহ। তবে ঈদের নামাযের পর ঈদগাহে নফল নামায পড়া মকরুহ হলেও ঘরে মকরুহ নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈদুল আজহা বা ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে তাশরীফ আনলেন। অতঃপর দুই রাকা'আত ঈদের নামায আদায় করলেন। এর আগে ও পরে কোনো নামায পড়লেন না। (মুসলিম ১৪৭৬)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈদের নামাযের পূর্বে কোনো নামায পড়তেন না। ঈদগাহ থেকে ঘরে ফিরে দুই রাকা'আত নামায আদায় করতেন। (ইবনে মাজাহ ১২৮৩)

☆ ঈদগাহে গমনকালে উচ্চৈস্বরে তাকবীর বলা :

হযরত সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈদুল ফিতরের দিন ঘর থেকে বের হয়ে ঈদগাহ পৌঁছা পর্যন্ত তাকবীর বলতেন। (দারাকুতনী ১৭৩৩)

হযরত ইবনে উমর (রা.) ঈদের দিন সকালেই ঈদগাহে রওনা করতেন এবং ইমাম আসা পর্যন্ত উচ্চৈস্বরে তাকবীর বলতে থাকতেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২/১৬৪)

☆ ঈদের নামাযে দুটি খুতবা প্রদান করা

হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) দুটি খুতবা দিতেন। উভয় খুতবার মাঝে একবার বসতেন। খুতবাতে কুরআন তেলাওয়াত করতেন এবং মানুষকে উপদেশ দিতেন । (মুসলিম ১৪২৬)

<u>তাকবীরে তাশরীকের বিধান :</u>

প্রত্যেক ফরজ নামায আদায়কারী ব্যক্তি, মুকীম, মুসাফির, মুক্তাদী, ইমাম, একাকী নামায আদায়কারী, পুরুষ, মহিলা, শহরবাসী বা গ্রামবাসী সকলের জন্য জিলহজের ৯ তারিখ ফজর থেকে ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর একবার তাকবীরে তাশরীক পাঠ করা ওয়াজিব। পুরুষগণ উচৈচস্বরে বলবে এবং মহিলাগণ অনুচ্চস্বরে।

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِى أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ (البقرة ٢٠٣)

এই আয়াত আয়্যামে তাশরীকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। এবং واذكروا বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং সকলে এর অন্তর্ভুক্ত।

হযরত জাবের (রা.) সূত্রে বণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আরাফার দিন তথা জিলহজের ৯ তারিখ ফজর থেকে তাশরীকের শেষ দিন তথা ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর তাকবীর বলতেন। (দারাকুতনী ১৭৫৪)

তাকবীরে তাশরীক :

তাকবীরে তাশরীক হলো –

যেমন হাদীস শরীফে এসেছে–

عن عبد الله رضى الله عنه أنه كان يكبر ايام التشريق : الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد

وفى رواية بسنده قال: قلت لابى اسحاق كيف كان تكبير على وعبد الله؟ فقال كانا يقولان الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৫৬৯৭)

<u>ঈদুল আজহার নামায :</u>

☆ ঈদের নামাযের হুকুম

'ঈদের নামায প্রত্যেক মুসলমান বালেগ পুরুষের ওপর ওয়াজিব।

ঈদের নামায আদায়ের পদ্ধতি

ঈদের নামায হলো দুই রাকা'আত। হাদীসে এসেছে-

উমর (রা.) বলেন : 'জুমু'আর নামায দুই রাকা'আত, ঈদুল ফিতরের নামায দুই রাকা'আত, ঈদুল আজহার নামায দুই রাকা'আত ও সফর অবস্থায় নামায হলো দুই রাকা'আত।' (নাসায়ী ১৪০৩)

ঈদের নামায শুরু হবে তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে।

ঈদের নামাযে অতিরিক্ত প্রত্যেক তাকবীরের পর হাত উঠাবে। প্রথম রাকা'আতে তাকবীরসমূহ আদায় করার পর সূরা ফাতেহা পড়বে, তারপর যে কোনো সূরা পড়বে। দ্বিতীয় রাকা'আতে কেরাত শেষ হওয়ার পর অতিরিক্ত তাকবীর বলবে এবং রুকুতে যাবে। নামায শেষ হওয়ার পর ইমাম সাহেব খুতবা দেবেন। মনে রাখা দরকার, ঈদের খুতবা হবে নামায আদায়ের পর। নামায আদায়ের পূর্বে কোনো খুতবা নেই। হাদীসে এসেছে-

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিন ঈদগাহের উদ্দেশ্যে রওনা হতেন। ঈদগাহে প্রথমে নামায শুরু করতেন। নামায শেষে মানুষের দিকে ফিরে খুতবা দিতেন, এ খুতবাতে তিনি তাদের ওয়াজ করতেন, উপদেশ দিতেন, বিভিন্ন নির্দেশ দিতেন। আর এ অবস্থায় মুসল্লীগণ তাদের কাতারে বসে থাকত।' (বুখারী শরীফ ৯০৩)

ঈদের নামায অতিরিক্ত ৬ তাকবীরে পড়া সুন্নাত

১. "আবু আব্দুর রহমান কাসেম (রহ.) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন, (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুল ফিতরের দিন আমাদেরকে ঈদের নামায পড়ান, এর প্রতি রাকা'আতে তিনি চারটি করে তাকবীর বলেন। নামায শেষে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলেন, ভুলে যেয়ো না, জানাযার নামাযের তাকবীরের মতো চারটি করে তাকবীর হবে। বৃদ্ধাঙ্গুলি বন্ধ করে অবশিষ্ট চারটি আঙুল দিয়ে তিনি এদিকে ইঙ্গিত করেন। (তাহাবী শরীফ ৪/৩৪৫, হাদীস নং ১৬৫৯)

২. "হযরত সাঈদ ইবনুল আস হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) ও হুযাইফা (রা.) কে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুল আজহা ও ঈদুল ফিতরের নামাযে কয় তাকবীর দিতেন? উত্তরে তিনি বলেন, জানাযার নামাযের তাকবীরের সমসংখ্যক (চার) তাকবীর দিতেন। তখন হুযাইফা (রা.) বলেন, ঠিক বলেছেন। আবু মূসা (রা.) আরো বলেন, আমি যখন বসরার গভর্নর ছিলাম, ঈদের নামাযে এভাবে চার তাকবীর দিতাম। আবু আয়েশা বলেন, এ ঘটনার আমি প্রত্যক্ষদর্শী, সাঈদ ইবনে আসের সঙ্গে আমিও ছিলাম।

ইবনে আবী শায়বার বর্ণনায় উল্লেখ আছে, ঈদের নামাযে জানাযার নামাযের মতো চার তাকবীর হবে, বাক্যটি আমি আজও ভুলিনি। (আবু দাউদ ১/৬৮২, হাদীস নং ১১৫৩, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/৪৯৪, হাদীস নং ৫৬৯৪, তাহাবী শরীফ ৪/৩৪৬, হাদীস নং ১৬৬১, মুসনাদে আহমদ ৪/৪১৬, হাদীস নং ১৯৩.

"হযরত আলকমা ও আসওয়াদ (রহ.) বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) উভয় ঈদের নামাযে ৯টি করে তাকবীর দিতেন। প্রথম রাকা'আতে কেরাআত পড়ার পূর্বে তাকবীরে তাহরীমা ও ঈদের তাকবীর মিলে চারটি তাকবীর। অতঃপর রুকুর জন্য তাকবীর বলে রুকুতে যেতেন। আর দ্বিতীয় রাকা'আতে কেরাআত শেষ করে ঈদের তিন তাকবীর ও রুকুর একটি তাকবীর মিলে চারটি তাকবীর দিতেন। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৩/২৯৩, হাদীস নং ৫৬৮৬, তাবরানী-কাবীর ৯/৩৫২, হাদীস নং ৯৫১৭)

৪. "ইবনে হারেস বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) কে বসরায় ঈদের নামায পড়ার সময় ৯টি তাকবীর দিতে দেখেছি। আরো বলেন, আমি সাহাবী মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) কেও এমনই করতে দেখেছি। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ৩/২৯৫, হাদীস নং ৫৬৮৯)

৯ তাকবীর কোন কোনটি তা উপরের হাদীসে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

৫. "হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রা.) এক ব্যক্তিকে বায়আতে রিজওয়ানে অংশগ্রহণকারী চারজন সাহাবীর নিকট প্রেরণ করেন, ঈদের নামাযে তাদের তাকবীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য। জিজ্ঞাসার পর তাদের প্রত্যেকের নিকট থেকে উত্তর আসে "ঈদের নামায (রুকুতে যাওয়ার দুই তাকবীরসহ) ৮ তাকবীর হবে। বর্ণনাকারী বলেন, এই বিবরণ আমি ইবনে সীরীন (রহ.) কে জানালে তিনি বলেন, "ঠিক বলেছেন।" (তবে ঈদের নামাযের ৬ তাকবীর এবং রুকুতে যাওয়ার দুই তাকবীর মিলে ৮ তাকবীরই হয়) কিন্তু এর পূর্বে প্রথম রাকা'আতে নামায শুরু করার তাকবীরের কথা এখানে উল্লেখ করেননি। (তাই ৮ তাকবীর বলেছেন, অন্যথায় মোট ৯ তাকবীর হতো) (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/৮৯৪, হাদীস নং ৫৬৯৫)

৬. "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) আমাদেরকে একবার ঈদের নামায পড়ান। এতে তিনি মোট ৯ তাকবীর দেন। প্রথম রাকা'আতে (তাকবীরে তাহরীমা ও ঈদের নামাযের ৩ তাকবীর ও রুকুতে যাওয়ার তাকবীরসহ) ৫টি তাকবীর। আর দ্বিতীয় রাকা'আতে (ঈদের নামাযের ৩ তাকবীর ও রুকুতে যাওয়ার তাকবীর মিলে) ৪টি তাকবীর দেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/৪৯৫, হাদীস নং ৫৭০৭)

৭. "হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহ.)

থেকে বর্ণিত, হযরত আনাস (রা.) বলেন, ঈদের নামাযে মোট তাকবীর সংখ্যা হলো ৯টি। নামায শুরু এবং রুকুতে যাওয়ার তাকবীরসহ প্রথম রাকা'আতে ৫টি এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে ৪টি। (ত্বাহাবী শরীফ ৪/৩৪৮, হাদীস নং ১৬৭৪)

৭. "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি ঈদের নামাযের প্রতি রাকা'আতেই ধারাবাহিক চারটি তাকবীর প্রদান করতেন।"

কুরবানীর আহকাম ও ফযীলত :

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

"নিজের রবের জন্য নামায পড়ো এবং কুরবানী দাও।" (কাওসার ২)

পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হচ্ছে :

আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি, যাতে আমি তাদেরকে জীবনোপকরণস্বরূপ যেসব চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছি, সেগুলোর ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। (সূরায়ে হজ ৩৪)

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরাম নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে জিজ্ঞেস করেছেন কুরবানী কী? নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, কুরবানী হলো তোমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সুন্নাত। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, এতে আমাদের জন্য কী বিনিময় রয়েছে? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, কুরবানীর জন্তুর প্রত্যেক পশমের বিনিময়ে একটি করে সওয়াব রয়েছে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে ভেড়ার ব্যাপারে কী হুকুম? নবীজি (সা.) বলেন, ভেড়ার প্রতিটি লোমের পরিবর্তে একটি করে সওয়াব পাওয়া যাবে। (ইবনে মাজাহ ২৬৬)

হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, কুরবানীর দিন কুরবানীর চেয়ে উত্তম ও প্রিয় কোনো আমল নেই। কিয়ামত দিবসে কুরবানীর জন্তু শিং, পশম, খুরসহ উপস্থিত হবে এবং কুরবানীর জন্তুর রক্ত মাটিতে পতিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলার কাছে কবুল হয়ে যায়, তাই তোমরা খুব আনন্দচিত্তে কুরবানী করো। (তিরমিযী ১৪১৩)

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে না, সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে। (ইবনে মাজাহ ৩১১৪)

☆ সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য কুরবানী করা ওয়াজিব :

উপরোল্লিখিত কুরআনের আয়াতে নামাযের সাথে কুরবানী করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ঈদের নামায যেমন ওয়াজিব, কুরবানীও ওয়াজিব। উপরোল্লিখিত হাদীসে সামর্থ্যবান ব্যক্তির কুরবানী না করার ওপর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। আর ওয়াজিবের ক্ষেত্রেই সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়। সুতরাং বোঝা যায়, পরিবারে যতজন সদস্য সামর্থ্যবান থাকবে সকলের ওপর পৃথকভাবে কুরবানী করা ওয়াজিব। আরেক হাদীসে বর্ণিত –

হযরত মিখনাফ ইবনে সুলাইম (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আরাফার দিন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে ছিলাম, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, হে লোকসকল! প্রত্যেক (সামর্থ্যবান) গৃহস্তের ওপর প্রতিবছর কুরবানী (ওয়াজিব) রয়েছে। (সুনানে ইবনে মাজাহ)

এ ছাড়া নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হিজরতের পর প্রত্যেক বছরই কুরবানী করেছেন। কোনো বছর কুরবানী পরিহার করেননি। যে আমল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গুরুত্ব দিয়ে লাগাতার করেছেন, কোনো সময় ছেড়ে দেননি, এটি উক্ত আমল ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ।

কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ :

কুরবানী তাদের জন্য ওয়াজিব, যাদের মধ্যে নিম্নবর্ণিত শর্তগুলো পাওয়া যাবে।

☆ মুসলমান হওয়া। কাফিরের ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয়।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত আবুবকর (রা.) তাকে বাহরাইনের দিকে পাঠনোর সময় এই ফরমান লিখে দিলেন, শুরু করছি আল্লাহর নামে, যিনি করুণাময় ও অতীব দয়ালু। এটি সদকার বিধান, যা রাসূলুল্লাহ (সা.) মুসলমানদের ওপর নির্ধারণ করে দিয়েছেন। (বুখারী ১৩৬২)

এটি সাওয়াবের উদ্দেশ্যে করা হয়। কাফেররা সওয়াবের উপযুক্ত নয়।

☆ আযাদ তথা স্বাধীন হওয়া। গোলামের ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয়।

হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, গোলামের সম্পদে কোনো যাকাত নেই। (মুসান্নাফে আব্দুর রজ্জাক ৩/১৬১)

☆ মুকীম হওয়া। মুসাফিরের ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয়।

হযরত ইবরাহীম বলেন, মুসাফিরদের জন্য কুরবানীর ব্যাপারে ছাড় দেওয়া হয়েছে। (মুসান্নাফে আব্দুর রজ্জাক ৪/৩৮২)

☆ নেসাবের মালিক হওয়া (বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়)। যারা নেসাবের মালিক নয় তাদের ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে না, সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে। (ইবনে মাজাহ ৩১১৪)

এই হাদীসে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী না করার ওপর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্তারোপ করা হয়নি।

☆ কুরবানীর সময় :

কুরবানীর সময় জিলহজ মাসের দশ তারিখ সূর্য উদিত হওয়ার পর থেকে ১২ জিলহজ সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত। অবশ্য জবাই ঈদের নামাযের পর আরম্ভ করতে হবে।

বারা ইবনে আযেব (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের উদ্দেশে খুতবা দিলেন। তাতে বললেন, আমাদের এই দিবসে প্রথম কাজ নামায আদায় করা, এরপর কুরবানী করা। সুতরাং যে এভাবে করবে তার কাজ আমাদের তরীকা মতে হবে। (বুখারী ২/৮৩২; সহীহ মুসলিম ২/১৫৪; সহীহ ইবনে হিব্বান ৫৯০৭)

হযরত নাফে সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেছেন, কুরবানী হচ্ছে ঈদুল আজহার দিনের পরও দুদিন। অর্থাৎ ১১ ও ১২ জিলহজ। (মুআত্তা মালেক ৯২৩)

হযরত জুনদুব ইবনে আবু সুফিয়ান আল বাজালী সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। ...তারপর বললেন, যে ব্যক্তি নামাযের পূর্বে কুরবানীর জন্তু জবাই করেছে সে যেন এর পরিবর্তে আরেকটি জবাই করে। যে জবাই করেনি সে যেন (এখন নামাযের পর) জবাই করে। (বুখারী ৫১৩৬)

হযরত বারা (রা.) হতে বর্ণিত, ...অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, যে ব্যক্তি নামাযের আগে জবাই করল সে তা নিজের জন্যই জবাই করল। (অর্থাৎ আল্লাহর জন্য কুরবানী হয়নি) আর যে ব্যক্তি নামাযের পর জবাই করল, তার কুরবানী আদায় হয়ে গেল এবং সে মুসলমানদের নিয়ম মতেই তা করল। (মুসলিম ৩৬২৪)

☆ প্রথম দিন কুরবানী করা উত্তম, এরপর দ্বিতীয় দিন এরপর তৃতীয় দিন :

হযরত উমর, আলী ও ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, কুরবানীর সময় তিন দিন। তবে উত্তম হলো প্রথম দিন। (নসবুররায়া ৪/২১৩)

☆ কুরবানীর জন্তু নিজ হাতে জবাই করা মুস্তাহাব। অন্যের মাধ্যমেও করানো যায়।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) দুটি দৃষ্টিনন্দন শিংওয়ালা ভেড়ার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং নিজ হাতে সে দুটিকে জবাই করলেন। (বুখারী ৫১২৮)

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, হে ফাতেমা ওঠো! তোমার কুরবানীর জন্তুর কাছে যাও। কেননা তার রক্তের প্রথম ফোঁটার সাথে তোমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর বলো, নিশ্চয় আমার নামায, আমার ইবাদত...।

☆ জন্তু জবাইয়ের দু'আ :

রাসূলুল্লাহ (সা.) কুরবানীর জন্তু জবাইয়ের সময় পবিত্র কুরআনের দুটি আয়াত পাঠ করেছেন।

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ

এবং

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ لَا شَرِیْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ

এরপর بسم الله، الله اكبر বলে জবাই করেছেন। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৪/২১)

☆ জন্তু দিনে জবাই করা মুস্তাহাব। রাতে জবাই করা মকরূহে তানযীহী। তবে নিজের আরামে ব্যঘাত না ঘটলে, অন্ধকারের কারণে জন্তু জবাইয়ে সমস্যা না হলে, কোনো ক্ষতির আশংকা না থাকলে এবং জন্তুর রগ কাটা গেল কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ না থাকলে তথা দিনের মতো ভালোভাবে জন্তু জবাই করতে পারলে রাতেও জবাই করা যাবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা.) রাতে কুরবানী করতে বারণ করেছেন। (আল-মুজামুল কাবীর ১১৪৫৮)

কুরবানীর জন্তু :

গৃহপালিত সর্বপ্রকার জন্তু তথা ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, গরু, মহিষ এবং উট দ্বারা কুরবানী করা জায়েয।

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমরা কুরবানীতে মুসিন্না ছাড়া জবাই করো না। তবে সংকটের অবস্থায় ছ'মাস বয়সী ভেড়া দুম্বা জবাই করতে পারবে। (মুসলিম ৩৬৩১)

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে হুদায়বিয়ার বছর এক একটি উট ও গরুতে সাতজনে শরীক হয়ে কুরবানী করেছি। (মুসলিম ২৩২২/৩০৪৮)

☆ গরু, মহিষ এবং উট সাতজনের পক্ষ হতে কুরবানী করা যাবে।

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে হুদায়বিয়ার বছর এক একটি উট ও গরুতে সাতজনে শরীক হয়ে কুরবানী করেছি। (মুসলিম ২৩২২/৩০৪৮)

☆ সকল অংশীদারের নিয়্যাত কুরবানীর জন্য হতে হবে।

"এগুলোর গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, কিন্তু পৌঁছে তাঁর কাছে তোমাদের অন্তরের তাকওয়া।" (সূরা

হজ ৩৭)

হযরত উমর (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সকল ইবাদাত নির্ভর করে নিয়্যাতের ওপর। (বুখারী ১)

হযরত হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে একমাত্র সাওয়াব লাভের আশায় কুরবানী করবে, তা তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবে। (মুজামুল কাবীর ২৭৩৬০)

☆ গরু এবং মহিষ দুই বছর এবং উট পাঁচ বছর পূর্ণ হলে তা দিয়ে কুরবানী করা জায়েয হবে। ছাগল, দুম্বা ও ভেড়া এক বছর পূর্ণ হতে হবে। দুম্বা ও ভেড়া যদি এক বছর পূর্ণ না হয় বরং বছরের বেশাংশ অতিবাহিত হয় এবং দেখতে স্বাস্থ্যগতভাবে এক বছরের বাচ্চার মতো মনে হয় তবে সেরূপ দুম্বা ও ভেড়া দিয়ে কুরবানী জায়েয হবে।

হযরত নাফে (রহ.) সূত্রে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) কুরবানী এবং হজ ও ওমরার জন্তুর ক্ষেত্রে উটের মধ্যে পাঁচ বছর বয়স অতিক্রমকারী, গরু মহিষের মধ্যে ২ বছর অতিক্রমকারী ও বকরি ও ভেড়ার মধ্যে ১ বছর অতিক্রমকারী জন্তুর কথা বলতেন। (মুআত্তা মালেক ৭৫৪)

হযরত উকবা ইবনে আমির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা.) তাকে কিছু বকরি (ভেড়া) সাহাবীদের মধ্যে বণ্টন করতে দিলেন। বণ্টন করার পর একটি বকরির বাচ্চা বাকি থেকে যায়। তিনি তা নবী (সা.) কে অবহিত করেন। তখন তিনি বললেন, তুমি নিজে এটাকে কুরবানী করে দাও। (বুখারী ২১৩৬/২১৫৩)

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমরা (কুরবানীতে) মুসিন্না ছাড়া জবাই করো না। তবে সংকটের অবস্থায় ছ'মাস বয়সী ভেড়া দুম্বা যবেহ করতে পারবে। (মুসলিম ৩৬৩১)

হযরত কুলাইব (রহ.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী করীম (সা.)-এর একজন সাহাবীর সাথে ছিলাম, যাঁর নাম মুজাশি। তিনি সুলাইম গোত্রের লোক ছিলেন। তখন বকরি ভেড়া দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠলে তিনি একজন ঘোষণাকারীকে এই ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, নিশ্চয়ই ছয় মাস বয়সের দুম্বা কুরবানী ইত্যাদির ক্ষেত্রে এক বছর বয়সের দুম্বার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। (আবু দাউদ ২৪১৭)

☆ কুরবানীর জন্তু মোটাতাজা এবং নিখুঁত হওয়া উত্তম।

হযরত আবুল আশাদ্দ সুলামী তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সাতজন ব্যক্তির সপ্তম জন ছিলাম। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের প্রত্যেককে এক দেরহাম করে জমা করার জন্য বলেন। অতঃপর আমরা জমাকৃত সাত দেরহাম দিয়ে একটি কুরবানীর পশু খরিদ করলাম। তারপর আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয়ই আমরা ইহা অনেক দামে ক্রয় করেছি। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, উত্তম কুরবানী, যা অধিক মূল্যবান ও মোটাতাজা হয়ে থাকে। (মুসনাদে আহমদ ১৫৫৩৩)

☆ খাসীকৃত জন্তু দিয়ে কুরবানী করা জায়েয বরং উত্তম।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) যখন কুরবানী করার ইচ্ছা করতেন তখন দুটি বড় মোটা তাজা শিংওয়ালা সুন্দর রংবিশিষ্ট মেষ ক্রয় করতেন...। (ইবনে মাজাহ ৩১১৩)

হযরত আবু রাফে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) দুটি মোটাতাজা খাসীকৃত ভেড়ার কুরবানী করেছেন। (মুসনাদে আহমদ ২৬৬৪৯ ইত্যাদি)

☆ যেসব জন্তু দ্বারা কুরবানী করা যায় না :

যে জন্তুর জন্মগত শিং নেই বা মাঝখানে ভেঙে গেছে তা দিয়েও কুরবানী জায়েয।

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি গাভি সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানী করা যায়। অতঃপর আমি বললাম, যদি গাভি বাচ্চা দেয় তাহলে কী করব। তিনি বললেন, বাচ্চাকেও গাভির সাথে জবাই করে দাও। আমি বললাম, খোঁড়া পশু! সে সম্পর্কে তিনি বলেন, যদি কুরবানীর স্থানে হেঁটে যেতে পারে তাহলে কুরবানী করবে। আমি বললাম, শিংভাঙা পশু! তিনি বললেন, এমন পশু দিয়ে কুরবানী করতে কোনো সমস্যা নেই। আমাদেরকে নবী করীম (সা.) আদেশ করেছেন, কুরবানীর পশুর চোখ ও কান ভালোভাবে দেখে নেওয়ার জন্য। (তিরমিযী ১৪২৩)

হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) আমাদেরকে কান কাটা এবং শিংভাঙা পশু দিয়ে কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন। আমি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িবকে বিষয়টি বললাম। তিনি বললেন, عضب হলো যে পশুর শিং অর্ধেক বা এর চেয়ে বেশি ভেঙে গেছে। (তিরমিযী ১৪২৪)

অতিশয় ক্ষীণ দুর্বল পশু দিয়ে কুরবানী হবে না।

হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (জবাইয়ের স্থানে যেতে পারে না এমন) খোঁড়া পশু, মারাত্মক ধরনের রুগ্ণ পশু এবং অতিশয় ক্ষীণ দুর্বল পশু দিয়ে কুরবানী

করা যাবে না, যার হাড্ডির মগজ শুকিয়ে গেছে। (তিরমিযী ১৪১৭)

☆ অধিকাংশ লেজ বা কানকাটা পশু দিয়ে কুরবানী হবে না।

হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) আমাদেরকে কানকাটা এবং শিংভাঙা পশু দিয়ে কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন। আমি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িবকে বিষয়টি বললাম। তিনি বললেন, عضب হলো যে পশুর শিং অর্ধেক বা এর চেয়ে বেশি ভেঙে গেছে। (তিরমিযী ১৪২৪)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন যে, (এক-তৃতীয়াংশের কম) লেজকাটা পশু দিয়ে কুরবানী করতে কোনো সমস্যা নেই। (আস সুনানুল কুবরা, বাইহাকী ১৯৬৬৭)

☆ কানবিহীন জন্তু দ্বারা কুরবানী করা জায়েয নেই।

হযরত ইয়াযীদ মিসরী (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি উতবা ইবনে আবদ আস সুলামীর নিকট গেলাম। তাঁকে বললাম, আবু ওয়ালিদ! আমি কুরবানীর পশুর তালাশে বের হয়েছি। কিন্তু দাঁতভাঙা একটি পশু ছাড়া কোনো পছন্দমতো পশু পেলাম না। তাই পশুটি আমার পছন্দ হলো না। তুমি কী বলো? উতবা বলল, ওটাকে আমার কাছে আনলে না! আমি বললাম আশ্চর্য! তোমার জন্য জায়েয আর আমার ক্ষেত্রে নাজায়েয। উতবা বলল, হ্যাঁ, তুমি সন্দেহ করছ, আমি সন্দেহ করছি না। রাসূলুল্লাহ (সা.) কানবিহীন, অন্ধ, শিংভাঙা পশু দ্বারা কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন। (আসসুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী ১৯৫৭৪)

☆ স্তনকাটা জন্তু দ্বারা কুরবানী হবে না।

ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সা.) বলেন, কানা, দুর্বল, চর্মরোগবিশিষ্ট ও স্তনকাটা পশুর কুরবানী জায়েয নেই।

কুরবানীর গোশত ও চামড়া

☆ কুরবানীদাতার জন্য কুরবানীর গোশত খাওয়া জায়েয।

...অতপর কুরবানীর স্থানে গিয়ে তিনি নিজ হাতে তেষট্টিটি পশু কুরবানী করলেন। এরপর যা অবশিষ্ট থাকল তা আলী (রা.) কে দিলেন এবং তিনি তা কুরবানী করলেন। তিনি নিজে তাকে কুরবানীর পশুতে শরীক করলেন। তারপর তিনি প্রত্যেক পশুর কিছু অংশ নিয়ে একটি হাড়িতে রান্নার নির্দেশ দিলেন। গোশত রান্না হলে তাঁরা দুজনেই তা থেকে খেলেন ও এর শোরবা পান করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) সওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহ পৌঁছলেন...। (মুসলিম ২৮১৫)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, তোমরা কুরবানীকারীগণ কুরবানী থেকে খাও। (মুসনাদে আহমদ ৯০৪৭)

☆ কুরবানীর গোশত গরিব এবং ধনী সকলকে খাওয়ানো জায়েয। উত্তম হলো কুরবানীর গোশতকে তিন ভাগে ভাগ করে এক ভাগ সদকা করা, এক ভাগ নিজে এবং পরিবারের জন্য রাখা, আরেকভাগ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের মাঝে বণ্টন করা। সমস্ত গোশত নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য রেখে দেওয়াও জায়েয।

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔

তোমরা আহার করো এবং আহার করাও যে যাচঞা করে না তাকে এবং যে যাচঞা করে থাকে। (হজ ৩৬)

হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথমে তিন দিন পর কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছিলেন। পরবর্তীতে এর অনুমতি দিয়ে বলেন খাও, পাথেয় হিসেবে সঙ্গে নাও এবং সংরক্ষণ করে রাখো। (মুসলিম ৩৬৪৪)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এবং কুরবানীর গোশতের এক-তৃতীয়াংশ নিজ পরিবার-পরিজনকে খাওয়াবে, আরেক ভাগ দরিদ্র আত্মীয়স্বজন, অপর ভাগ ফকীর-মিসকীনগণকে। (মানারুস্সাবীল ১/১৮৯)

☆ মানতের কুরবানীর গোশত সদকা করে দিতে হবে।

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ۔ (التوبة:٦٠)

নিশ্চয় সদকা ফকীর-মিসকীনদের জন্য। (তাওবা ৬)

হাকাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আলী (রা.) বলেছেন, মানতের পশু থেকে খাওয়া যাবে না। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৩/৫৫৬)

☆ কুরবানীর চামড়া নিজে ব্যবহার করতে পারে, ধনীকেও দিতে পারে। কিন্তু কুরবানীর চামড়া বিক্রি করা যাবে না। কেউ যদি করে তার মূল্য সদকা করে দেওয়া আবশ্যক।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কুরবানী পশুর চামড়া বিক্রি করে তার কুরবানী পরিপূর্ণ হয় না। (আসসুনানুল কুবরা লিলবাইহাকী ১৯৭০৮)

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন তাঁর কুরবানীর পশুর নিকটে দাঁড়িয়ে থাকি এবং পশুটির গোশত, চামড়া এবং ঝুল/সালু সদকা করে দিই। আর তা থেকে যেন কসাইকে না দিই। তিনি বলেন, আমরা তাকে (কসাইকে) নিজের পক্ষ থেকেই দিতাম। (মুসলিম ২৩২০)

হযরত যাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত আবু কাতাদা (রা.) একদিন বাড়িতে এসে কুরবানী গোশতের ছরীদের পাত্র পেলেন। কিন্তু তিনি খেতে অসম্মতি জানালেন। অতঃপর তিনি কাতাদা ইবনে নোমানের কাছে এসে খবরটি জানালেন যে, এক হজে রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি তোমাদেরকে কুরবানীর গোশত তিন দিনের বেশি খেতে নিষেধ করেছিলাম। যাতে তোমাদের জন্য পর্যাপ্ত হয়। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এটা হালাল করে দিলাম। তোমরা তা যত দিন ইচ্ছা খাও। তিনি বলেন, হাদী ও কুরবানীর গোশত বিক্রয় করো না। সুতরাং তোমরা খাও, সদকা করো এবং চামড়া দিয়ে উপকৃত হও। আর তোমাদেরকে যদি কুরবানীর গোশত খেতে দেওয়া হয়, চাইলে তাও তোমরা খেতে পারো। (মুসনাদে আহমদ ১৬২৫৫)

☆ কসাইদের কাজের বিনিময় বা বেতন কুরবানীর গোশত এবং চামড়ার মূল্য থেকে প্রদান করা যাবে না।

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন তার কুরবানীর পশুর নিকটে দাঁড়িয়ে থাকি এবং পশুটির গোশত, চামড়া এবং ঝুল/সালু সদকা করে দিই। আর তা থেকে কসাইকে না দিই। তিনি বলেন, আমরা তাকে (কসাইকে) নিজের পক্ষ থেকেই দিতাম। (মুসলিম ২৩২০)

☆ নবী (সা.) এবং মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে কুরবানী করা :

হিনশ (রহ.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আলী (রা.) কে দেখলাম তিনি দুটি ভেড়ার কুরবানী করলেন। আমি তাঁর কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে কুরবানী করার জন্য অসিয়্যত করেছেন। তাই আমি নবী করীম (সা.)-এর পক্ষ থেকে কুরবানী করলাম। (আবু দাউদ হাদীস নং ২৭৯০)

আরেক বর্ণনায় আছে, হযরত আলী (রা.) দুটি ভেড়া কুরবানী দিয়েছেন। একটি নিজের নামে, অপরটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামে। কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমাকে নবী করীম (সা.) এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আমি এ কাজ ছাড়ব না। (আবু দাউদ ২৭৯, তিরমিযী ১৪৯৫)

আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে ঈদুল আজহার দিন ঈদগাহে হাজির হলাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) খুতবা শেষ করে মিম্বার থেকে নামলেন এবং একটি ভেড়া আনা হলো, রাসূলুল্লাহ (সা.) তা নিজ হাতে জবাই করলেন এবং বললেন,

বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর, এটি আমার এবং উম্মতের ওই সকল লোকদের জন্য, যারা কুরবানী করেনি। (আবু দাউদ ১৮১০, তিরমিযী ১৫২১)

তানযীমুল মাদারিসিদ দ্বীনিয়া বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হিফজের শিক্ষক সাহেবানদের জন্য

দশ দিনব্যাপী

হিফজ প্রশিক্ষণ-২০১৪ইং

তারিখ : **২২ নভেম্বর শনিবার হতে ১ ডিসেম্বর সোমবার পর্যন্ত। (মোট দশ দিন)**

উদ্বোধনী সবক : প্রথম দিন সকাল ১০টায়।

স্থান : **তানযীম মিলনায়তন, তানযীম ভবন, জমিল মাদরাসা, বগুড়া।**

দীর্ঘদিনের সফল, অভিজ্ঞ হাফেজ ও কারী সাহেবানগণ প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন।

আশা করি, হিফজের সার্বিক মানোন্নয়নকল্পে হাফেজ সাহেবগণ যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করবেন।

ইসলামী অর্থনীতি

মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-৯

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

বাঈ ছরফের অস্তিত্বময় শর্তদ্বয়ের মধ্যে দ্বিতীয় শর্ত (تماثل) অর্থাৎ বিনিময়দ্বয় এক রকম হওয়া।

Similarity-এর ব্যাখ্যাঃ

আরবী শব্দ তামাছুল বা মুমাছালাত অর্থ সমান হওয়া, অনুরূপ হওয়া। তাই বাঈ ছরফের মধ্যে যখন বিনিময়দ্বয় সমজাতীয় হবে যথা–দিনারের বিনিময়ে দিনার বা দিরহামের বিনিময়ে দিরহামের ক্রয়-বিক্রয় হয় তাহলে বিনিময়দ্বয়ের মধ্যে কোনো একটি অপরটির তুলনায় কোনো প্রকারের অতিরিক্ত হওয়া অবৈধ এবং এ ক্ষেত্রে উন্নত-অনুন্নত হওয়া গৌণ। পাত্রের রূপে হোক বা মুদ্রার রূপে। কেননা এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহ মুতলাক বা ব্যাপক। তাই এতে উল্লিখিত সকল প্রকারই অন্তর্ভুক্ত থাকবে। উদাহরণস্বরূপ মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন–

الذهب بالذهب والفضة بالفضة (الى ان قال) مثلا بمثل سواء بسواء يدابيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدابيد- (رواه البخارى ومسلم وابوداود والترمذى)

অর্থাৎ স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে এবং রৌপ্যকে রৌপ্যের বিনিময়ে সমান সমান এবং হাতে হাতে বিক্রি করো। যখন বিনিময়দ্বয় সমজাতীয় হবে না। তখন ইচ্ছামতো বিক্রি করেত পারো। তবে তখনও হাতে হাতে লেনদেন হওয়া অত্যাবশ্যকীয়।

উপর্যুক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয়, বাঈ ছরফের বিনিময়দ্বয় যদি সমজাতীয় না হয় যথা–একপক্ষে দিরহাম অপরপক্ষে দিনার তাহলে অতিরিক্ততা বৈধ। তবে তখনও আকদের মজলিসে বিনিময়দ্বয়ের ওপর ক্রেতা-বিক্রেতার হস্তগত করা জরুরি।

উপর্যুক্ত শর্ত থেকে নির্গত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মাসআলা–

১। দুই দিরহাম + এক দিনার = দুই দিনার + এক দিরহামের ক্রয়-বিক্রয় জমহুর হানফী ইমামদের মতে বৈধ। কেননা উক্তাবস্থায় দুই দিরহাম দুই দিনারের বিনিময়ে এবং এক দিনার এক দিরহামের বিনিময়ে বাঈ ছরফ হবে।

পাঠক! নিশ্চয় উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে বিনিময়দ্বয় সমাজাতীয় হয়নি বিধায় অতিরিক্ততা বৈধ হবে।

২। ১১ দিরহাম = ১০ দিরহাম + এক দিনার। এ ধরনের বাঈ ছরফও বৈধ। কেননা উক্ত পদ্ধতিতে ১০ দিরহাম ১০ দিরহামের পরিবর্তে এবং এক দিরহাম এক দিনারের পরিবর্তে হবে। সুতরাং পাঠক! নিশ্চয় উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে ১০ দিরহাম ১০ দিরহামের পরিবর্তে হওয়ায় বিনিমদ্বয়ের মধ্যে সমতা ও অনুরূপতা বিদ্যমান। এবং এক দিরহাম এক দিনারের বিনিময় হলে বিনিময়দ্বয় যেহেতু সমজাতীয় নয় তাই সমতাও অপরিহার্য নয়।

৩। ১০ দিরহাম = ৯ দিরহাম + অন্য কোনো পণ্য অথবা ১০ দিরহাম + ৯ দিনার + অন্য কোনো পণ্য।

উক্ত মাসআলাটা তিন ধরনের হতে পারে।

ক. প্রথমাংশের অন্য কোনো পণ্যের মূল্য ১ দিরহাম হবে। দ্বিতীয়াংশে অন্য কোনো পণ্যের মূল্য এক দিনারের সমান হবে।

খ. উভয়াংশে অন্য কোনো পণ্যের মূল্য এক দিরহাম বা এক দিনার থেকে কম হবে।

গ. উভয়াংশে অন্য কোনো পণ্যের কোনো মূল্যই থাকবে না। উল্লিখিত তিন প্রকারের মধ্য থেকে প্রথম তথা ক. নির্দ্বিধায় বৈধ হবে। দ্বিতীয় তথা খ. মকরুহের সাথে জায়েয হবে এবং তৃতীয় প্রকার তথা গ. কোনো অবস্থাতেই বৈধ হবে না।

উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত প্রকারত্রয়ের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার তথা খ. তে এই হীলা অবলম্বনের অবকাশ থাকে যে, বিনিময়দ্বয়ের একপক্ষে স্বর্ণ বা রৌপ্যের যে অংশটুকু অতিরিক্ত হবে তাকে ওই অন্য পণ্যের বিনিময় যদি ধরে নেওয়া হয় তাহলে বিনিময়দ্বয় সমজাতীয় না হওয়ার দরুন কোনো প্রকার মকরুহ হওয়ার কথা নয়। তবে তা সত্ত্বেও ওলামায়ে কেরাম উক্ত পদ্ধতিকে মাকরুহ বলেছেন। কেননা ওই ধরনের হীলা করার অনুমতি যদি প্রদান করা হয় তাহলে রিবাল ফজল বা বিনিময়সংক্রান্ত সুদের দরজা উন্মুক্ত হয়ে পড়বে। হানফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) কে বাঈ ছরফের উক্ত পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে كيف تجده فى قلبك আপনি এই পদ্ধতিকে কেমন মনে করেন? প্রতিউত্তরে তিনি বলেন, مثل الجبل পাহাড়ের ন্যায়। (হিদায়া ফতহুল কদীরসহ ৬/২৬৭-২৭১)

বাঈ ছরফের অবিদ্যমান শর্তদ্বয়ের প্রথম শর্ত হলো, পছন্দ-অপছন্দের স্বাধীনতার শর্ত (Optional Condition) না থাকা।

এই শর্তটার ব্যাখ্যার পূর্বে পাঠক মহলের জ্ঞাতার্থে Option-এর প্রসিদ্ধ কিছু প্রকার উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছি। ক. খিয়ারে শর্ত Optional Condition খ. খিয়ারে রুইয়াত- Seeing option গ. খিয়ারে আইব Defective option

খিয়ার তথা Option-এর সংজ্ঞা :

খিয়ার বলা হয়

حق العاقد فى فسخ العقد او امضاء ه لظهور مسوغ شرعى او بمقتضى اتفاق عقدى (الخيار واثره فى العقود ١/٤٣)

অর্থাৎ আকদ বাতিল বা বাস্তবায়নের ওই অধিকার, যা আকদকারীর জন্য ওই সময় অর্জিত হয় যখন মুয়ামালার মধ্যে কোনো প্রকারের শরয়ী অবকাশ সৃষ্টি হয়। তাকে খিয়ার বা Option বলা হয়। অথবা আকদকারীর ওই অধিকারকে খিয়ার বলা হয় যা আকদ করার জন্য উক্ত মুয়ামালাতে কৃত কোনো চুক্তির ভিত্তিতে অর্জিত হয়।

☆ খিয়ারে শর্ত তথা Optional Condition-এর সংজ্ঞা :

Optional Condition বলা হয় যা কোনো শর্তের কারণে অর্জিত হয়। অর্থাৎ ওই শর্তটা না পাওয়া গেলে Option ও পাওয়া যাবে না। যথা

ان يشترط فى العقد او بعده الخيار لاحد المتعاقدين او كليهما فى فسخ العقد وامضاء ه (المرجع السابق)

অর্থাৎ আকদের সময় অথবা আকদের পরে আকদকারীদের মধ্যে যে কেউ বা উভয়ে আকদ বাতিল বা বাস্তবায়নের শর্তারোপ করা।

ব্যাখ্যা : খিয়ারে শর্তের মর্মার্থ হলো, আকদের মধ্যে আকদকারীদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়কে এমন ইখতিয়ার দেওয়া যে, সে যদি ইচ্ছা করে ওই আকদটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাতিলও করতে পারে, বাস্তবায়নও করতে পারে। তাই এই শর্তের ভিত্তিতে আকদকারীদের মধ্যে যার জন্যই উল্লিখিত ইখতিয়ার অর্জিত হবে সে উক্ত নির্ধারিত সময়ের ভেতর উক্ত শর্ত মতে অর্জিত ইখতিয়ার ব্যবহার করতে পারে। ইচ্ছা হলে আকদ বাতিল করতে পারে বা বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই ধরনের খিয়ার Option-এর জন্য সময় নির্ধারিত থাকা জরুরি। ইমাম আজম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে উক্ত সময় তিন দিন এবং ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে উক্ত সময় তিন দিনের বেশিও হতে পারে এটি হানফী মাযহাবের স্বীকৃত মত। (আল খিয়ার ওয়া আছরুহু ফিল উকূদ ১/১০৩)

☆ খিয়ারে রুইয়াত বা Seeing Option-এর সংজ্ঞা :

যেই ইখতিয়ার ক্রেতা পণ্য না দেখে ক্রয় করার কারণে অর্জিত হয়।

حق يثبت به للمتملك الفسخ او الامضاء عندرؤية محل العين الذى عقد عليه ولم يره (المرجع السابق)

অর্থাৎ ওই অধিকারকে খিয়ারে রুইয়াত বা Seeing Option বলা হয়, যার ভিত্তিতে মালিকানা অর্জনকারীর জন্য আকদ বাতিল করণ বা বাস্তবায়নের অধিকার অর্জিত হয়, যখন সে ওই নির্দিষ্ট স্থান, পণ্য বা মালকে দেখবে, যার ওপর আকদ করা হয়েছে অথচ আকদের সময় সে তা দেখেনি।

সারমর্ম, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো পণ্য বা মাল দেখা ব্যতীত ক্রয় করে ওই পণ্য বা মাল দেখার পরে (ক্রেতার জন্য) ইখতিয়ার হাসিল হবে, সে ওই আকদটা বহাল রাখার বা বাতিল করার।

☆ খিয়ারে আইব বা Defective Option-এর সংজ্ঞা :

অর্থাৎ ওই অপশন, যা ক্রয়কৃত পণ্যের মধ্যে কোনো প্রকারের ত্রুটি বা অপূর্ণতার কারণে ক্রেতার জন্য অর্জিত হয়। (ফতহুল কাদীর ২/২)

ماثبت بسبب نقص يخالف ما التزمه البائع عرفا فى زمان ضمانه

অর্থাৎ খিয়ারে আইব বা Defective Option বলা হয়, যা এমন কোনো ত্রুটি বা অপূর্ণতার কারণে ক্রেতার অর্জিত হয়। স্বাভাবিক প্রচলন মতে পণ্যটা বিক্রেতার দায়িত্বে থাকাকালীন যার দায়ভার বিক্রেতা গ্রহণ করে থাকে।

সারমর্ম, বিক্রেতা পণ্য বিক্রির সময় যদি নিশ্চয়তা প্রদান করে থাকে যে, বিক্রিতব্য পণ্য নির্ভেজাল ও ত্রুটিমুক্ত, এমতাবস্থায় উক্ত পণ্য বা মালের মধ্যে যদি এমন কোনো ত্রুটি পাওয়া যায়, যা তার নিশ্চয়তার পরিপন্থী এমতাবস্থায় এর দায়ভার বিক্রেতাকেই বহন করতে হবে। (আল খিয়ার ওয়া আছরুহু আনিল হাত্তাব আলাল খলীল ৪/৪২৭, ২/৩৪৭)

উল্লিখিত খিয়ার Option-এর প্রকারত্রয়ের মধ্যে আকদ সর্বাবস্থায় বাতিল-বাস্তবায়নের অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি বিদ্যমান থাকে। তাই প্রশ্ন হলো, বাঈ ছরফের মধ্যে উল্লিখিত খিয়ার Options সমূহের অবকাশ আছে কি না?

উত্তর : বাঈ ছরফের মধ্যে যেহেতু বিনিময়দ্বয়ের ওপর ক্রেতা-বিক্রেতার জন্য আকদের মজলিসেই কবজ করা জরুরি। তাই এতে খিয়ারে শর্ত বা Optional Condition-এর কল্পনাও করা যায় না। তবে বাঈ ছরফের মধ্যে খিয়ারে আইব বা Defective

Option-এর অবকাশ আছে। কেননা এমতাবস্থায় ক্রেতা-বিক্রেতা বিনিময়দ্বয়ের ওপর আকদের মজলিসেই হস্তগত করল, যার মাধ্যমে বাঈ ছরফ পরিপূর্ণ এবং Conferm হয়ে গেল এবং বিনিময়দ্বয়ের মালিকানা পরিবর্তন হয়ে গেল। কিন্তু পরবর্তীতে বিনিময়দ্বয়ের মধ্যে কোনো একটাতে ত্রুটি ধরা পড়ল। তাহলে তার জন্য উপরোক্ত খিয়ার অর্জিত হবে কেবল।

তদ্রূপ বাঈ ছরফের মধ্যে খিয়ারে রুইয়াত বা Seeing Optionও হতে পারে তবে বাঈ ছরফের মধ্যে যদি মুদ্রা Money কে মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় হয় অর্থাৎ যেখানে নির্ধারণ করলে নির্ধারিত হয় না, তখন বাঈ ছরফের মধ্যে খিয়ারে রুইয়াত বা Seeing Option-এর অবকাশ থাকে না।

জ্ঞাতব্য, বাঈ ছরফের মধ্যে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য বা যেকোনো একজনের জন্য খিয়ারে শর্ত থাকে তাহলে আকদ ফাসেদ হয়ে যাবে। তবে যদি ওই মজলিসের মধ্যেই আরোপিত খিয়ারে শর্ত প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় এবং বিনিময়দ্বয়ের ওপর ক্রেতা-বিক্রেতা হস্তগত করে নেয় তাহলে আকদ পুনর্বার যথার্থ হয়ে যাবে। খিয়ারে শর্ত বহাল থাকাবস্থায় যদি আকদের মজলিস সমাপ্ত করে দেয় এবং এর পরে যদি খিয়ারে শর্ত প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে আকদ শুদ্ধ বা যথার্থ হওয়ার কোনো অবকাশ থাকবে না বরং ফাসেদ বলেই সাব্যস্ত হবে।

☆ বাঈ ছরফের সর্বমোট চার শর্তের মধ্যে চতুর্থ ও অবিদ্যমান শর্তদ্বয়ের মধ্যে দ্বিতীয় শর্ত বিলম্বিত করণ Delaying/ Deferred Payment অর্থাৎ এ ধরণের শর্ত না থাকা বাঈ ছরফ যথার্থ হওয়ার জন্য শর্ত বরং উক্ত শর্ত পাওয়া গেলে বাঈ ছরফ বাতিল হয়ে যাবে। যার কারণ সুস্পষ্ট। কেননা বাঈ ছরফের মধ্যে যেহেতু বিনিময়দ্বয়ের তাৎক্ষণিক হস্তগত করার জরুরি, তাই যেকোনো একপক্ষের আদায় বা Payment যদি বিলম্বিত হয় তাহলে আকদের মজলিসে বিনিময়দ্বয়ের ওপর হস্তগত করণ পাওয়া গেল না বিধায় বাঈ ছরফ এ ধরনের শর্ত গ্রাহ্য করে না।

উল্লেখ্য, বিলম্বিত করণের সম্পর্ক সাধারণ বেচা-বিক্রির মধ্যে নির্ধারিত মূল্য বা Price-এর সাথে হয়ে থাকে। Subject Matter-এর সাথে নয়। এবং বায় ছরফের মধ্যে বিনিময়দ্বয় নির্ধারিত মূল্য বা Price ও Subject Matter ও তাই এতে কোনোটাই বিলম্বিতকরণকে গ্রহণ করবে না।

খিয়ারে শর্তের মত, যদি বাঈ ছরফের মধ্যে কোনো একপক্ষ তাৎক্ষণিক Payment না করার শর্ত পাওয়া যায় তবে আকদের মজলিশের মধ্যেই উক্ত শর্ত প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় এবং বিনিময়দ্বয়ের ওপর ক্রেতা-বিক্রেতা তখনই হস্তগত করে তাহলে বাঈ ছরফ শুদ্ধ হয়ে যাবে। আর যদি উক্ত শর্ত থাকা অবস্থায় বিনিময়দ্বয়ের ওপর হস্তগত করা ব্যতীত আকদের মজলিশ বরখাস্ত করে দেয় পরবর্তীতে উক্ত শর্ত প্রত্যাহার করলেও বাঈ ছরফ যথার্থ হবে না বরং ফাসেদ বলে গণ্য হবে।

উপর্যুক্ত আলোচনা সাপেক্ষে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আনুষঙ্গিক মাসআলা :

১। ইসলামী শরীয়তের প্রসিদ্ধ মূলনীতি হল, যে সমস্ত পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ে বিনিময়দ্বয়ের মধ্যে সমতা জরুরি না বরং কমবেশ করা যায় ওই সব পণ্য মাপ ব্যতীত অনুমান করে বিক্রি করাও বৈধ। পক্ষান্তরে যেসব পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সমতা জরুরি ওগুলোকে অনুমান করে ওজন করা ছাড়া বিক্রি করা অবৈধ। উক্ত নীতিমালা চার মাযহাবের সমন্বিত নীতিমালা। এতে কারো মতানৈক্য নেই। তাই স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে এবং রৌপ্যের বিনিময়ে তদ্রূপ, গমকে গমের বিনিময়ে অনুমান করে ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণরূপে হারাম। তবে রৌপ্যকে স্বর্ণের বিনিময়ে অথবা গমের বিনিময়ে অনুমান করে ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ।

২। যদি কেউ স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে ওজন করা ব্যতীত অনুমান করে বিক্রি করল, যা অবৈধ কিন্তু আকদের ওই মজলিসেই পরক্ষণে বিনিময়দ্বয়কে ওজন করে নিল এবং বিনিময়দ্বয় সমান সমান প্রমাণিত হলে শরীয়তের প্রসিদ্ধ মূলনীতি ইসতিহসানের ভিত্তিতে ওই লেনদেন বৈধ হয়ে যাবে। তবে উক্ত কর্মসম্পাদন আকদের মজলিশ বরখাস্ত হয়ে যাওয়ার পরে করলে আকদটা পূর্বের ন্যায় ফাসেদ বলে বিবেচিত হবে।

৩। তরবারীকে তরবারীর বিনিময়ে অথবা পিতল/তাম্রের কোনো পাত্রকে পিতল/তাম্রের পাত্রের বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রি করল। উল্লিখিত বস্তু যদি সংখ্যায় গণনার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়ের রেওয়াজ ও প্রচলন থাকে তাহলে শরীয়তে দৃষ্টিতে বৈধ হবে। কেননা কোনো বস্তু সংখ্যায় বিক্রিতব্য হওয়া কারো মতেই সুদের কারণ নয়। তবে যদি সংখ্যায় বিক্রয়ের রেওয়াজ না থাকে বরং ওজন করে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলন থাকে তাহলে উক্ত পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় বাতিল বলে সাব্যস্ত হবে। কেননা উক্তাবস্থায় সুদের কারণ ওজন + সমজাতীয় হওয়া বিদ্যমান। তাই উক্ত পণ্যগুলো অনুমান করে বিক্রি করা বৈধ হবে না।

৪। রৌপ্যের মধ্যে খাদ (ভেজাল)

মিশ্রিত থাকে অথবা স্বর্ণের মধ্যে। এমতাবস্থায় এটিকে যদি অন্য ধাতবদ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রি করে তাহলে দেখতে হবে মিশ্রিত রৌপ্য বা স্বর্ণের পরিমাণ কতটুকু। যদি রৌপ্যের মধ্যে রৌপ্যের পরিমাণ খাদ বা ভেজালের তুলনায় বেশি হয় তাহলে তা নিরেট ভেজালমুক্ত রৌপ্য বলে বিবেচিত হবে। তদ্রূপ স্বর্ণের ব্যাপারও। তাই ওই ধরনের ভেজাল মিশ্রিত স্বর্ণ বা রৌপ্যকে সমজাতীয়ের বিনিময়ে অতিরিক্তসহ বিক্রি করা বৈধ হবে না। যদি রৌপ্য বা স্বর্ণের তুলনায় খাদ (ভেজাল)-এর পরিমাণ বেশি হয় তাহলে তাকে সাধারণ ধাতবদ্রব্য মনে করা হবে। তাই যেই ধাতবদ্রব্যের বিনিময়ে এটিকে বিক্রি করা হচ্ছে তা যদি সমজাতীয় হয় তাহলে তাতেও কোনো একপক্ষ অপরপক্ষের তুলনায় অতিরিক্ত সহকারে লেনদেন বৈধ হবে না।

উল্লেখ্য, উক্ত মাসআলাসমূহে স্বর্ণ বা রৌপ্য ভেজাল খাদের সমান হওয়াও আধিক্যের সমতুল্য। অর্থাৎ ভেজাল মিশ্রিত স্বর্ণ বা রৌপ্য যদি পরিমাণে খাদ (ভেজালের) সমানও হয় তখনও তাকে নিরেট স্বর্ণ বা রৌপ্য মনে করা হবে। তাই এর ওপরও পূর্বে উল্লিখিত মাসআলার বিধান প্রযোজ্য হবে।

৫। যেই তরবারীর ওপর রৌপ্যের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে তাকে سيف مفضض বলা হয় এবং যেই তরবারীর ওপর স্বর্ণের প্রলেপ ছাড়ানো থাকে, তাকে سيف مذهب বলা হয় এই প্রকারের তরবারীকে যদি স্বর্ণ বা রৌপ্যের বিনিময়ে বিক্রি করা হয় তাহলে অপরপক্ষ যদি স্বর্ণ বা রৌপ্য হয়ে তরবারীর বিপরীত হয়, সমজাতীয় না হয় অর্থাৎ তরবারীর সাথে জড়ানো রৌপ্য হয় অপর বিনিময় স্বর্ণ। তদ্রূপ তরবারীর সাথে জড়ানো স্বর্ণ হয় অপর বিনিময় রৌপ্য হয় তাহলে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে। কেননা এমতাবস্থায় বিনিময়দ্বয় সমজাতীয় না হওয়ার দরুন অতিরিক্ততাসহ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে। যদি সমজাতীয় হয় যথা, তরবারীর সাথে জড়ানো স্বর্ণ আবার অপর বিনিময়ও স্বর্ণ অথবা তরবারীর সাথে জড়ানো রৌপ্য অপর বিনিময়টাও রৌপ্য এমতাবস্থায় দেখতে হবে যে, তরবারীর সাথে জড়ানো স্বর্ণ বা রৌপ্যের তুলনায় অপর বিনিময় স্বর্ণ বা রৌপ্য বেশি কি না? অর্থাৎ ছমনের পরিমাণ বেশি কি না? যদি বেশি হয় তাহলে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে। এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের ইমামদের প্রসিদ্ধ নীতিমালা হলো কোনো ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে চুক্তির Subject Matter যদি কয়েক প্রকার পণ্য দ্বারা মিশ্রিত হয় যেগুলোর মধ্য থেকে কোনো অংশ ছামান বা প্রাইজের সমজাতীয় হয় এবং অন্য অংশ ছমন বা প্রাইজের সমজাতীয় না হয় ছমনের হিসাব সমজাতীয়কেন্দ্রিক হবে এবং ক্রয়-বিক্রয় বৈধ বলে বিবেচ্য হবে।

উদাহরণস্বরূপ, উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যায় রৌপ্যের প্রলেপযুক্ত তরবারীতে ৫০ দিরহাম সমপরিমাণের রৌপ্য ছিল। তাকে এক ১০০ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করল। ক্রেতা ৫০ দিরহাম আদায় করল। অবশিষ্ট ৫০ দিরহাম বাকি রাখল। তা সত্ত্বেও উক্ত লেনদেন বৈধ হয়ে যাবে। কেননা এ ক্ষেত্রে ৫০ দিরহাম পর্যন্ত বাঈ ছরফ ছিল এবং ওই পরিমাণ বিনিময়দ্বয়ের ওপর ক্রেতা-বিক্রেতার তাৎক্ষণিক হস্তগতকরণ পাওয়া গেছে বিধায় উক্ত আকদ শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ এবং অবশিষ্ট ৫০ দিরহাম হবে তরবারীর প্রাইজ, যা সাধারণ বেচাবিক্রির অন্তর্ভুক্ত। তাই এতে বিনিময়দ্বয়ের ওপর তাৎক্ষণিক হস্তগতকরণ জরুরি নয়।

৬। উপরোক্ত মাসআলায় যদি ৫০ দিরহামের ওপরও কব্জ পাওয়া না যায় তাহলে বাঈ ছরফের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত বিনিময়দ্বয়ের ওপর তাৎক্ষণিক হস্তগত করণের অনুপস্থিতির কারণে বাঈ ছরফের অংশ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু অপর অংশ অর্থাৎ তরবারীর বিনিময়ে ৫০ দিরহামসংক্রান্ত চুক্তির সমাধান ব্যাখ্যাসাপেক্ষ।

ক. যদি তরবারী থেকে রৌপ্যকে পৃথক করা হয় তাহলে তরবারী ক্ষতিগ্রস্ত হলে তরবারীর ক্রয়-বিক্রয়ও ফাসেদ হয়ে যাবে।

মোটকথা, এমতাবস্থায় উক্ত লেনদেনের উভয় অংশ ফাসেদ হয়ে গেল।

খ. যদি রৌপ্যকে তরবারী থেকে খুব সহজে পৃথক করা যায় তাহলে তরবারীর অংশে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে। বিক্রেতা তরবারী থেকে রৌপ্যগুলো পৃথক করে তরবারীটা ৫০ দিরহামের বিনিময়ে ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করবে।

৭। উপরোক্ত মাসআলায় যদি ছামান বা প্রাইজ তরবারীর সাথে সংযুক্ত স্বর্ণ বা রৌপ্যের সমান বা কম হয় তাহলে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে না। কেননা, এর মধ্যে রিবাল ফজল বা বিনিময়সংক্রান্ত সুদ পাওয়া যায়।

৮। রৌপ্যের একটা পাত্র, যা বিক্রেতা ১০০ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করল। তবে ক্রয়-বিক্রয়ের মজলিসে ক্রেতার পক্ষ থেকে বিক্রেতা ৫০ দিরহাম হস্তগত করল। অবশিষ্ট ৫০ দিরহাম বাকি থাকল। এমতাবস্থায় যে পরিমাণ ছমন বা প্রাইজ হস্তগত হলো ওই পরিমাণ ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হবে। অবশিষ্টাংশ বিক্রেতার মালিকানাধীন রয়ে যাবে। তাই উক্ত পাত্র উভয়ের মধ্যে যৌথ মালিকানাধীন বলে বিবেচ্য হবে।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

দারুল উলুম দেওবন্দ : দ্বীন প্রচারের সূতিকাগার

হাফেজ রিদওয়ানুল কাদির উখিয়াভী

খ্রিস্টীয় উনিশ শতক পুরো দুনিয়া বিশেষত ইসলামী জগতের জন্য এক মহাক্রান্তিকাল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। পশ্চিমা উপনিবেশবাদ তাদের ঘাড়ের ওপর চেপে বসেছিল। রাজনৈতিক-সামাজিক এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাদের অভাবিত প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে তারা সমগ্র বিশ্বের জন্য বিষফোঁড়ায় পরিণত হয়েছিল। পশ্চিমা উপনিবেশবাদের সাথে ছিল খ্রিস্টান ধর্ম এবং ধর্মদ্রোহীতার বাঁধ ভাঙা প্লাবণ। পুরো ইসলামী সাম্রাজ্যের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, তখনকার মুসলমানদের চিন্তাশক্তি এবং অদম্য কর্মস্পৃহায় চিড় ধরেছিল। ইন্দোনেশিয়া থেকে মরক্কো, তথা পূর্ব থেকে পশ্চিম কোথাও এমন কোনো উল্লেখযোগ্য আন্দোলন ছিল না, যা তৎকালীন দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে পশ্চিমা উপনিবেশবাদ এবং ভয়াল নাস্তিকতার বিরুদ্ধে চীনের মহাপ্রাচীরের মতো প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। উম্মাহর এমন এক মহাক্রান্তিকালে 'দারুল উলুম দেওবন্দ' সর্বপ্রথম বিদ্রোহের আওয়াজ তোলে। প্রথমদিকে যদিও আওয়াজ দুর্বল এবং ক্ষীণ ছিল কিন্তু ধীরে ধীরে সেই আওয়াজটাই নাস্তিকতা, বদদ্বীনি, জুলুম-নির্যাতন এবং বর্বরতার কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দিয়েছে। মাত্র অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে পুরো বিশ্ব তার কৃতিত্বের সামনে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছে।

ইসলামী জগতে সর্বাধিক প্রভাব সৃষ্টিকারী ধর্মীয় আন্দোলন :

এ এক স্বতঃসিদ্ধ বাস্তবতা যে, মুসলমানদের সামগ্রিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দারুল উলুম দেওবন্দের অবিস্মরণীয় অবদান রয়েছে। দারুল উলুমের দীর্ঘ ইতিহাসে কত পানি কত দিকে গড়িয়েছে, রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়েছে, কত উত্থান-পতন হয়েছে, কিন্তু দ্বীন ইসলামের প্রদীপ্ত এই মশাল তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে একবিন্দু পরিমাণ পিছপা হয়নি। দৃঢ়তা এবং অবিচলতার সাথে সে এগিয়ে চলেছে তার অভীষ্ট লক্ষ্যপানে। চিন্তা এবং মতাদর্শের এমন নাযুকতম সময়ে, বিশেষত পাশ্চাত্যের ঈমান-আক্বীদা বিধ্বংসী ষড়যন্ত্রের মহাক্রান্তিকালে দারুল উলুমের মতো কিছু মুসলমানদের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী প্রতিষ্ঠান যদি না হতো, তাহলে তারা আত্মবিস্মৃতি এবং স্থবিরতার কোন ঘূর্ণিপাকে আবর্তিত হতো, তা ভাবতেই গা শিউরে ওঠে। দাওয়াত-তাবলীগ, শিক্ষা-দীক্ষাসহ জীবনের এমন কোনো সেক্টর নেই, যেখানে দারুল উলুমের রুহানী সন্তানদের দীপ্ত পদচারণ নেই। উম্মতের ইসলাহ এবং সংশোধনের যথাযথ হক আদায়ে তারা কুণ্ঠাবোধ করেনি। ওয়াজ-নসীহত এবং দাওয়াত-তাবলীগের তৎকালীন মহাসমাবেশগুলো দারুল উলুমের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের উপস্থিতিতে পূর্ণতা লাভ করত। বর্তমানে বড় বড় ইসলামী বিদ্যাপীঠের সেবক হিসেবেও নিজেদেরকে নিয়ে যাচ্ছেন অনন্য উচ্চতায়।

দারুল উলুম দেওবন্দ শুধুমাত্র একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, বরং একটি স্বতন্ত্র রেনেসাঁ এবং ধর্ম সংস্কারের মহান সূতিকাগার। যার সাথে হিন্দুস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ পুরো এশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকার অসংখ্য, অগণিত খাঁটি মুসলমানের শিকড়ের সম্পর্ক। তারা দেওবন্দকে নিজেদের চেতনার বাতিঘর হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে। আলহামদুলিল্লাহ! এশিয়ার সীমানা পাড়ি দিয়ে অন্ধকারের আঁতুড়ঘর আফ্রিকা, আমেরিকা এবং ইউরোপকেও সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত করার পুরো ক্রেডিট একমাত্র দেওবন্দই দাবি করতে পারে। ওই সব নগরী আজ দারুল উলুমের রুহানী সন্তানদের দীপ্ত পদচারণে মুখরিত। দারুল উলুমের শাখা-প্রশাখা গড়ে উঠেছে আজ বিশ্বের প্রায় সব কেন্দ্রীয় নগরীতে।

উপমহাদেশে দ্বীন প্রচারের কেন্দ্রবিন্দু :

উপমহাদেশের মুসলমানদের ধর্মীয় ক্ষেত্রে দারুল উলুম একটি পুনর্জাগরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। দারুল উলুম শুধুমাত্র একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই নয়, বরং মনস্তাত্ত্বিক ক্রমবিকাশ, সাংস্কৃতিক উন্নতি-অগ্রগতির ক্ষেত্রে এটি একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান, যার স্বচ্ছ জ্ঞানের ঝরণাধারা, উন্নত চরিত্রমাধুরী, এবং হিত কামনার ওপর মুসলমানদের অগাধ বিশ্বাসের সাথে আছে অনেক গর্বও। যেভাবে আরবরা এক যুগে গ্রিকদের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। তদ্রূপ এই যুগে দারুল উলুম দেওবন্দ ধর্মীয় জ্ঞান বিশেষত ইলমে হাদীসের যে অবিস্মরণীয় খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, ইলমের ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লেখার

মতো এক গৌরবজনক অধ্যায়।

ইলমী অবক্ষয়ের এ যুগে উপমহাদেশে ধর্মীয় জ্ঞান এবং ইসলামী সংস্কৃতির রক্ষণাবেক্ষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি দারুল উলুম বরং তের শতাব্দীর শেষ লগ্ন এবং চৌদ্দ শতাব্দীর শুরু লগ্নে সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার অনবদ্য কীর্তির ছাপ স্পষ্ট বিদ্যমান।

হিন্দুস্তানে যখন মোগল সাম্রাজ্যের সূর্য স্তিমিত হয়ে পড়ে, তখন ধুরন্ধর ইংরেজরা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাচীন সব বিদ্যাপীঠ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। তখন শুধুমাত্র ইসলামী জ্ঞান এবং সুস্থ সংস্কৃতি রক্ষার জন্যই শুধু নয়, বরং মুসলমানদের দ্বীন এবং ঈমান সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি নতুন আন্দোলনের গোড়াপত্তন হওয়া ছিল সময়ের চাহিদা, যা তাদেরকে খোদাদ্রোহীতা এবং বদ-দ্বীনির করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করবে। তখন ইসলাম নামক বৃক্ষের গোড়ায় তপ্ত খুন ঢেলে তাকে পত্র-পল্লবে সুশোভিত করার গুরুদায়িত্ব ছিল সম্পূর্ণ উলামায়ে কেরামের স্কন্ধে। কেননা ইসলামী শাসনের স্বপ্ন ছিল তখন সুদূর পরাহত। কিন্তু আল্লাহর শোকর, উলামায়ে কেরাম তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। মুসলমানদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবতায় রূপ দেয়ার ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে দারুল উলুম দেওবন্দ। দেওবন্দের সূর্য সন্তানরা শিক্ষা-দীক্ষা, ওয়াজ-নসীহত, কিতাব রচনা, বক্তৃতা, ফাতাওয়া প্রদান, তর্ক-বিতর্ক, সাংবাদিকতা, চিকিৎসাবিদ্যাসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সব শাখাতেই সরব পদচারণ করেছেন। তাদের এই বহুমুখী সেবা কোনো অঞ্চল কিংবা জনগোষ্ঠীর সাথে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা দেশের সীমানা পেরিয়ে পুরো বিশ্বে সৃষ্টি করেছে এক অনন্য নজির, যা আত্মম্ভরি এই ধরায় সত্যিই বিরল। দারুল উলুম দেওবন্দ তার উষালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীকে উপহার দিয়েছে এমন কিছু সোনার মানুষ, যাঁদের সংস্পর্শে কঠিন পাথরও মোমের মতো গলে যায়, অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং অশান্ত পৃথিবীতে যারা এখনো অনবরত সত্য এবং শান্তির ডাক দিয়ে যাচ্ছেন।

ইসলামের প্রচার-প্রসারে দেওবন্দের অনবদ্য কীর্তি ইতিহাসের আরেক জাজ্বল্যমান অধ্যায়। উপমহাদেশের বিগত দেড় শত বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, উপমহাদেশের মুসলমানদের ধর্মীয় ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে উলামায়ে দেওবন্দ। তাদের এই ঐতিহাসিক অবদানকে অস্বীকার করা আর ইতিহাসের এক চিরন্তন বাস্তবতাকে অস্বীকার করার মাঝে তেমন কোনো তফাত নেই।

ধর্মীয় শিক্ষার আন্তর্জাতিক আন্দোলনের মূল সূতিকাগার :

হিন্দুস্তানে অভিশপ্ত ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা চালু হওয়ার পর এক নতুন সংস্কৃতি এবং নব যুগের সূচনা হয়। উম্মাহর নাজুকতম সময়ে আবার গর্জে উঠল উলামায়ে দেওবন্দ। তারা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার-প্রসারে নিজেদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। আল্লাহর মেহেরবাণীতে তাদের আন্দোলনে আশাতীত সাড়া পাওয়া যায়। এরই ফলশ্রুতিতে উপমহাদেশের প্রত্যেক কোণায় কোণায় প্রতিষ্ঠিত হয় উম্মাহর স্বাতন্ত্রিক ঐতিহ্যের ধারক অসংখ্য ইসলামী মাদরাসা। অল্প সময়ে দারুল উলুমের খ্যাতি সারা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। স্বল্প সময়ে দারুল উলুম ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, বার্মা, তিব্বত, সিলুন, উত্তর এবং দক্ষিণ আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দ্বীন শিক্ষার আন্তর্জাতিক আন্দোলনের মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে সমাদৃত লাভ করে। তখন থেকে এখন পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ উপমহাদেশের সর্বত্র গড়ে উঠেছে অজস্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। দিন দিন এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি যেসব প্রতিষ্ঠান দারুল উলুমের চিন্তা-চেতনাকে লালন করে না, অথবা দারুল উলুমের পাঠ্যব্যবস্থার অনুসারী নয়, তারাও কর্মপদ্ধতিতে দারুল উলুমকেই অনুসরণ করে থাকে।

কট্টর শত্রুকেও স্বীকার করতে হবে, বর্তমানে উপমহাদেশে অসংখ্য যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা সরাসরি দারুল উলুমের পদাঙ্ক অনুসরণ করে থাকে, অথবা দারুল উলুমের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে ঐসব প্রতিষ্ঠান। এভাবে দারুল উলুম দেওবন্দের অস্তিত্ব ইসলামের ইতিহাসে এক নবদিগন্তের সূচনা করেছে। হিন্দুস্তানে কত মাদরাসা আছে, তার সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নেই। তবুও একটি হিসাব অনুযায়ী ছোট-বড় মাদরাসার সংখ্যা দশ হাজার ছাড়িয়ে যাবে। এ ছাড়া প্রত্যেক মসজিদ এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে লাখ লাখ মক্তব রয়েছে, তার হিসাব তো আলাদা। হিন্দুস্তান ছাড়া পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের প্রত্যেক এলাকায় এ ধারার অজস্র মাদরাসা বিদ্যমান। সেখানকার বড় প্রতিষ্ঠানসমূহে হাজার হাজার

তালিবুল ইলমের পদচারণ। পাকিস্তানে শুধুমাত্র বেফাকুল মাদারিসের অধীনেই রয়েছে বিশ হাজারের কাছাকাছি মাদরাসা, যার অধিকাংশই দারুল উলুম দেওবন্দের সাথে সম্পৃক্ত। এভাবে আমাদের বাংলাদেশেও দেওবন্দী ধারার মাদরাসার সংখ্যা ২৫ হাজারেরও বেশি। এ ছাড়া উপমহাদেশের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহেও (যেমন বার্মা, নেপাল, আফগানিস্তান ইরান এবং শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি) দেওবন্দী ধারার অজস্র মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আফ্রিকা মহাদেশে, দক্ষিণাঞ্চলীয় রাষ্ট্রসমূহে বিশেষত দক্ষিণ আফ্রিকায় অসংখ্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইউরোপ মহাদেশে বিশেষ করে যুক্তরাজ্যে বড় বড় অসংখ্য মাদরাসার উপস্থিতি সত্যিই আমাদেরকে আশান্বিত করে। আটলান্টিক মহাসাগরের ওপারে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজে জ্বলে উঠেছে দ্বীনের দীপ্ত এসব মশাল। যেগুলো অহর্নিশ সত্য এবং সুন্দরের শাশ্বত বাণী শুনিয়ে যাচ্ছে লোকদেরকে। অন্যদিকে পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত ফিজি, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডেও হকের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে দেওবন্দী ধারার এসব মাদরাসা।

ইসলামের অজেয় দুর্গ :

ইসলামের মৌলিক আক্বীদা-বিশ্বাসের হেফাজত, ইসলামী দর্শন এবং সংস্কৃতিকে যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ, ভ্রান্ত মতবাদসমূহের অসারতা জনসাধারণকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অবহিত করার মধ্য দিয়ে উলামায়ে দেওবন্দ তাঁদের ওপর উম্মাহর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। হিন্দুস্তানে অভিশপ্ত ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের ফলে মুসলমানরা নতুন-নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়। ইসলামের আজন্ম শত্রুরা মুসলমানদের মাঝে বিভেদ এবং অনৈক্যের বীজ বপন করার নিমিত্তে ভ্রান্ত মতাবলম্বীদেরকে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা দিতে থাকে। স্বয়ং মুসলমানদের একটি দল ছিল, যাদের চরিত্রমাধুরী, নৈতিকতা বলতে কিছুই ছিল না। তাদের আক্বীদা-বিশ্বাস ছিল কচুরিপানার মতো টলমলায়মান। স্বার্থের প্রশ্নে তাদের কাছে ঈমান-আক্বীদা ছিল একেবারে নস্যি ব্যাপার। তখন চতুর্মুখী হামলায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে মুসলিম সমাজ। একদিকে পুরো খ্রিস্টীয় জগৎ আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত, হিন্দুদের অসহনীয় উৎপাত, অন্যদিকে কিছু এমন মুসলমানের উদ্ভব ঘটে, যারা মূলত ইসলামের ছদ্মাবরণে ইসলামের মূলোৎপাটনের অপচেষ্টায় ব্যাপৃত।

দারুল উলুম দেওবন্দ তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ অবধি ইসলামের বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্র হয়েছে, চাই তা পরোক্ষভাবে হোক বা প্রত্যক্ষভাবে, সামাজিকভাবে হোক বা রাজনৈতিকভাবে, ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। তাদেরকে যেভাবে দমন করা দরকার, সে পন্থাই তারা অবলম্বন করেছে। ইসলামের জন্য কুরবানী এবং আত্মত্যাগের অনন্য নজির স্থাপন করেছে তারা। তারা ছিল এই হাদীসের বাস্তব প্রতিচ্ছবি-

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين

ভবিষ্যত প্রজন্মে এই ইলমের ধারকবাহক হবে এমন কিছু নীতিবান লোক, যারা সীমালংঘনকারীদের বিকৃতি সাধন, ভ্রান্ত লোকদের যাচ্ছে তাই মন্তব্য এবং অজ্ঞ লোকদের ভুল ব্যাখ্যা থেকে এই ইলমকে সম্পূর্ণরূপে হেফাজত করবে। (আসসুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী হা. ২০৯১১)

এই হাদীসের ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী তারা কুরআন, হাদীস, ইজমা এবং পূর্বসূরিদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দ্বীন-ইসলামের স্বরূপ অনাগত প্রজন্মের সামনে যথাযথভাবে উপস্থাপন করেছে। তারা সকল প্রকার রক্তচক্ষু এবং চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করেছে বলে আমরা পেয়েছি নির্ভেজাল ঈমান, স্বচ্ছ আক্বীদা। কত ধরনের যে ষড়যন্ত্র হয়েছে। কিন্তু তারা সব ষড়যন্ত্রকে ধূলিস্মাৎ করে দিয়ে ইসলামের ঝাণ্ডাকে পৃথিবীর বুকে পত পত করে উড়িয়েছে।

খ্রিস্টানদের সাথে মোকাবিলা :

হিন্দুস্তানের ওপর যখন ইংরেজ একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে, তখন এই অঞ্চলে খ্রিস্টান মিশনারিদের আনাগোনা আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পায়। তারা এই আত্মপ্রসাদে ভুগছিল যে, আমরা বিজয়ী জাতি, আর এরা পরাজিত জাতি, তাই তাদের ওপর অপসংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া হবে ডাল-ভাতের মতো সহজ। তারা চেয়েছিল, ইসলামের আক্বীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে সেখানকার জনগণকে সন্দিহান করে তুলবে এবং এরপর তাদেরকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করে তাদের জাহান্নামে যাওয়ার রাস্তা সুগম করবে। অথবা বেশভূষায় মুসলমান থাকলেও তারা যেন চিন্তা-চেতনায় পুরোপুরি খ্রিস্টান হয়ে যায়। এ ধরনের ভয়ংকর ষড়যন্ত্র নিয়ে তারা কাজ আরম্ভ করে। কিন্তু তাদের সেই আশার গুড়ে বালি পড়ে, যখন তাদের এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেন উম্মাহর অতন্দ্র প্রহরী উলামায়ে দেওবন্দ। তাদের অশুভ তৎপরতাকে রুখে দিতে জান বাজি রেখে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন দেওবন্দের অকুতোভয়

সেনানীরা। তারা খ্রিস্টান মিশনারিদের সাথে শুধু ইলমী বিতর্ক করে ক্ষান্ত হননি, বরং খ্রিস্ট ধর্মের বিকৃতি এবং অসারতা সম্পর্কে জনসাধারণকে সম্যক অবগত করেন। এ ক্ষেত্রে হযরত রহমতুল্লাহ কীরানভী (রহ.) একাই পুরো খ্রিস্টজগতে কম্পন সৃষ্টি করেছিলেন।

হিন্দুদের সাথে মোকাবিলা :

অবিভক্ত ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ছিল এমন, যাদের বাপ-দাদা এককালে হিন্দু ছিল। ধুরন্ধর ইংরেজরা রাজনৈতিকভাবে আধিপত্য বিস্তার করার পর স্থানীয় হিন্দুদেরকে এই বলে প্ররোচিত করল যে, এসব নওমুসলিমরা তো তোমাদেরই স্বজাতি। তোমরা তাদেরকে পুনরায় হিন্দু বানিয়ে নাও। তাহলে তোমাদের ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এভাবে ইংরেজদের পরামর্শ এবং পরোক্ষ তত্ত্বাবধানে শুরু হয় নওমুসলিমদের মুরতাদ বানানোর ঘৃণ্য মিশন। ইসলামের বিরুদ্ধে গজিয়ে ওঠা এই ষড়যন্ত্রের সফল প্রতিরোধ করেন দেওবন্দের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা। লেখনী, বক্তৃতা, তর্ক-বিতর্কসহ সম্ভাব্য সব পদ্ধতি প্রয়োগ করে এই ফিতনাকে প্রতিহত করেন তারা। বিশেষ করে উলামায়ে দেওবন্দের অগ্রসেনানী, অকুতোভয় সিপাহসালার হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী (রহ.) (১২৪৮-১২৯৭ হি.)-এর অসামান্য কীর্তি হিন্দুদের অগ্রযাত্রার পথে প্রধান অন্তরায় ছিল। উপমহাদেশের ধর্মীয় এবং সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে যার ন্যূনতম ধারণা আছে, তার সামনে এই কথাগুলো অত্যন্ত সুস্পষ্ট। হিন্দুস্তান বিভক্তির সময় যখন পুরো উপমহাদেশে রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছিল, তখনও বিভিন্ন সংগঠনের ছদ্মাবরণে মুসলমানদের মুরতাদ বানানোর হীন চক্রান্ত থেমে ছিল না। এমন নাজুক মুহূর্তেও রক্তের সাগর পাড়ি দিয়ে জনসাধারণের ঈমান-আক্বীদা রক্ষার আমরণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন দেওবন্দের বীর সেনানীরা। তাদের সংগ্রামের মাধ্যমেই থেমে যায় দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়া ধর্মদ্রোহীতার লেলিহান শিখা।

কাদিয়ানীদের সাথে মোকাবিলা :

ইসলামের মৌলিক আক্বীদা হলো খতমে নবুওয়াত। ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় তাদেরই তল্পীবাহক, বরং পোষা কুকুর মির্জা গোলাম কাদিয়ানীর মাধ্যমে যখন এই খতমে নবুওয়াত আক্রান্ত হয় এবং ওই কুলাঙ্গার নিজেকে নবী দাবি করার স্পর্ধা দেখায়, তখনও বীরদর্পে ময়দানে নেমে তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন বীর উলামায়ে দেওবন্দ। কাদিয়ানীদের ঈমান বিধ্বংসী আক্বীদা সম্পর্কে মুসলমানদেরকে সতর্ক করেন। দেওবন্দের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা নিজেদের মূল্যবান লেখনী, জ্বালাময়ী বক্তৃতা এবং নজিরবিহীন বিতর্কের মাধ্যমে তাদেরকে কোণঠাসা করে ফেলেছিল। উলামায়ে দেওবন্দের এই মোবারক কর্মধারা এখনও অব্যাহত আছে।

শিয়াদের সাথে মোকাবিলা:

পুরো হিন্দুস্তানে শিয়াদের ভ্রান্ত আক্বীদা মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। অনেকেই ছিল, যারা সঠিকভাবে কালেমা তাইয়েবাও পড়তে পারত না, কিন্তু শিয়াদের মতো তাযিয়াহ (হযরত হোসাইন (রা.) ও আহলে বাইতের কৃত্রিম কবর যা মুহাররমের সময় শিয়া সম্প্রদায়ের শোভাযাত্রায় বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়) পালন করাকে নিজেদের জন্য গর্বের বস্তু মনে করত। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এত বড় রাষ্ট্রে শিয়ারা আহলুস সুন্নাতের বিপরীতে যদিও ছিল একেবারে নগণ্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের ভ্রান্ত আক্বীদাগুলো এত অসংখ্য আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারীদের অন্তরে কিভাবে গেঁথে গিয়েছিল–সেটাই ছিল এক চূড়ান্ত বিস্ময়! উলামায়ে দেওবন্দের জন্য এটা অবশ্যই গর্বের বিষয় যে, তারা এই উপমহাদেশকে শিয়াদের অপবিত্র আক্বীদা-বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণরূপে পূতঃপবিত্র করেছে এবং মুসলমানদের অন্তরে ইসলামের স্বচ্ছ আক্বীদা-বিশ্বাস বসাতেও তারা যথেষ্ট পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছেন।

শিরক এবং বিদ'আত প্রতিরোধে উলামায়ে দেওবন্দ :

অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই যে, হিন্দুস্তানের মাটিতে ইসলামের আবির্ভাবের ফলে এখানকার পুরনো অনেক সভ্যতা, কৃষ্টি-কালচার, চিন্তা-চেতনা এবং ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থায় অভূতপূর্ব বিপ্লব সাধিত হয়। সর্বত্র বইতে থাকে পরিবর্তনের হাওয়া। কিন্তু সাথে সাথে এ কথাও অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এখানকার হিন্দুয়ানি সংস্কৃতিও মুসলমানদের জনজীবনে কম প্রভাব বিস্তার করেনি। এই প্রভাবগুলো মুসলিম সমাজে মারাত্মক আকার ধারণ করে। এই সংস্কৃতি আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি নয়, বরং বিধর্মীদের থেকে আমাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে, এই সাধারণ চেতনাটুকুও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। শুধু এটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং পেটপূজারী নামধারী আলেমরা শিরক-বিদ'আতকে বৈধতা দিয়ে একটি নতুন সম্প্রদায় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। উম্মাহর এমন ক্রান্তিকালে উলামায়ে দেওবন্দ কি চুপ করে বসে থাকতে পারেন? না, তারা আবার ওই সব পেটপূজারীদের বিরুদ্ধে ময়দানে

ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সত্যকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করলেন এবং মিথ্যাকে অপসারণ করলেন। জনসাধারণের সামনে বিদ'আতীদের স্বরূপ উন্মোচন করে তাদের স্কন্ধে অর্পিত উম্মাহর গুরুদায়িত্ব পালনে আবার পুরোপুরি নিষ্ঠা এবং আমানতদারীর পরিচয় দিলেন।

এ ক্ষেত্রে হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহ.) (মৃ. ১৩২৩হি.), মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.) (১২৬৯-১৩৪৬ হি.) এবং হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) (১২৮০-১৩৬২ হি.) যে অবিস্মরণীয় খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, তা ইতিহাসের এক স্বর্ণালি অধ্যায়। আলহামদুলিল্লাহ তাদের সুযোগ্য উত্তরসূরিরা আক্বীদা এবং আমল সংশোধনের এই পবিত্র ধারা চালু রেখেছে আজ অবধি।

লা-মাযহাবী ফিতনার প্রতিরোধ :

ইতিহাস সাক্ষী, উপমহাদেশের প্রায় সব মুসলিম শাসক ছিলেন হানাফী মাযহাবের সাচ্চা অনুসারী। সমস্ত আইন-কানুন হানাফী মাযহাব অনুযায়ী রচিত হতো। হিন্দুস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানও ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী। পুরো ইসলামের ইতিহাসে তাকলীদকে অস্বীকার করা, পূর্বসূরিদের সম্পর্কে বিষোদগার কিংবা তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করার মতো কোনো ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের প্রদীপ যখন নিভু নিভু অবস্থা, ব্রিটিশদের নেতৃত্ব যখন সময়ের ব্যাপার মাত্র, তখন হিন্দুস্তানে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠে অসংখ্য নতুন নতুন দল। লা-মাযহাবী ফিতনাও প্রসবিত হয় সে অন্ধকার যুগের কোনো এক অশুভ মুহূর্তে। এই ভ্রান্ত দলটি খারেজীদেরই নতুন রূপ। তারা নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে নির্ধারণ করে নেয়। পূর্বসূরিদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকেও তারা বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করেছে। সাধারণ মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাকে তারা সত্য-মিথ্যার মাঝে নিরূপক হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। আর যারা তাদের এই ভ্রান্ত চিন্তাকে সমর্থন করে না, তাদেরকে পথভ্রষ্ট আখ্যা দেওয়াটা তাদের কাছে ডালভাতের মতো সহজ। বরং তাদেরকে ইসলাম ধর্মের গণ্ডি থেকে বের করে দিতে তারা সিদ্ধহস্ত।

উলামায়ে দেওবন্দ তথাকথিত আহলে হাদীস, যারা হাদীসের ওপর আমল করার নাম দিয়ে স্বেচ্ছাচারিতা, প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং শেষে ইসলামের সীমানা পর্যন্ত অতিক্রম করে চলে যায়, তাদের শক্তভাবে প্রতিরোধ করেন। মাযহাবের ব্যাপারে তাদের উত্থাপিত প্রশ্নাবলির যে জ্ঞানগর্ভ এবং যুক্তিনির্ভর দাঁতভাঙা জবাব উপস্থাপন করেছেন, তা স্মরণে এলে তারা এখনো ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এই ফিতনাটি ভয়াবহ রূপ ধারণ করে, যখন তারা সৌদি আরবের ওহাবী আন্দোলনের সাথে একীভূত হয়ে আন্দোলন আরম্ভ করে। কিন্তু এর পরও তারা দেওবন্দের রূহানী সন্তানদের কাছে বারবার পরাস্ত হচ্ছে।

ফিরকায়ে ন্যাচারিয়ার সাথে মোকাবিলা :

ফিরকায়ে ন্যাচারিয়া (প্রকৃতি পূজারী দল) বলতে ওই দলকে বোঝানো হয়েছে, যারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও পশ্চিমা সভ্যতা সংস্কৃতি গ্রহণ করে শরীয়তের প্রতিটি বিধিবিধানকে গ্রহণ করা বা বর্জন করার ব্যাপারে নিজেদের সীমিত মেধা ও খোঁড়া যুক্তিকে মাপকাঠি হিসেবে নির্ধারণ করেছে এবং পশ্চিমা কৃষ্টি-কালচারকে সত্য-মিথ্যা ও ভালো-মন্দ বিচারের কষ্টিপাথর বানিয়েছে। অর্থাৎ শরীয়তের যেসব বিধান তাদের সীমিত বুদ্ধি-বিবেক ও খোঁড়া যুক্তিসম্মত হয়, সেগুলোকে তারা সঠিক ও গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেয়। অন্যথায় সেগুলোকে তারা মিথ্যা, অকার্যকর ও অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করে। এমনিভাবে ইসলামী শরীয়তের যে সমস্ত বিষয় পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিপন্থি বা বিরোধী ও ইউরোপীয় গোষ্ঠীর নিকট অপছন্দনীয় বা মনোপূত নয়, সেগুলোও তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত নয়। ন্যাচারিয়াদের এ ধরনের ঈমান বিধ্বংসী চিন্তা-চেতনার বিরুদ্ধে হকের দীপ্ত মশাল নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দারুল উলুম দেওবন্দের রূহানী সন্তানরা। তারা যে ধীরে ধীরে সাধারণ মুসলমানদেরকে ঈমানহারা করার অপচেষ্টায় ব্যাপৃত, তাও জনসাধারণের সামনে উন্মোচিত করেন তারা। এই ন্যাচারিয়া ফিরকার অবৈধ ঔরস থেকে পরবর্তীতে ফিতনায়ে ইনকারে হাদীস (হাদীস অস্বীকারকারীদের ফিতনা) এবং মওদূদী ফিতনার জন্ম হয়।

এখানে যা উল্লেখ করা হলো, তা দারুল উলুমের চতুর্মুখী খিদমতের বিপরীতে সাগরের এক বিন্দু পানির সমতুল্য মাত্র। মোটামুটি কথা হচ্ছে, পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে কোনো দল বা ব্যক্তি যখন সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে জনসাধারণকে সেদিকে দাওয়াত দেয় এবং মুসলিম উম্মাহর ঐক্যকে বিনষ্ট করার অপপ্রয়াস চালায়, তখনই গর্জে উঠেন বীর উলামায়ে দেওবন্দ। ভ্রান্ত আক্বীদার অসারতা এবং ইসলামী চেতনার শ্রেষ্ঠত্ব জনসাধারণকে বোঝাতে চেষ্টা করেন তারা।

আলহামদুলিল্লাহ! উলামায়ে দেওবন্দের

ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং অবর্ণনীয় মোজাহাদার বরকতে উপমহাদেশে এখনও গুঞ্জরিত হচ্ছে আল্লাহ এবং রাসূলের নাম, পথহারা মানবতা পাচ্ছে তার অভীষ্ট লক্ষ্যের ঠিকানা। রাস্তা-ঘাটে এখনও চোখে পড়ে সবুজ গম্বুজ। তাদের কুরবানীর কারণেই ইসলাম এত শতাব্দী পরও সজীব, সতেজ। মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, দাওয়াতের কাজ, মসজিদ বিনির্মাণ, গ্রন্থ রচনা, হিকমত ও প্রজ্ঞা ভরা বক্তৃতা, দুঃস্থ মানবতার সেবা, কোথায় নেই দেওবন্দের রূহানী সন্তানরা? যেখানেই দেখি, সেখানেই দেখতে পাই দেওবন্দের রূহানী সন্তানদের দীপ্ত পদচারণ! একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য এর চেয়ে বড় সফলতা আর কী হতে পারে?

ধর্ম প্রচার এবং সংস্কারের কেন্দ্রবিন্দু :

দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা হয় ইতিহাসের এক মহাক্রান্তিকালে, যখন উনিশ শতকের পশ্চিমা উপনিবেশবাদ পুরো ভারতবর্ষের কাঁধের ওপর সওয়ার হয়েছিল, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জেঁকে বসেছিল পশ্চিমা নগ্ন সংস্কৃতি, মানবতার ক্ষত-বিক্ষত লাশের ওপর দাঁড়িয়ে হর্ষোচ্ছ্বাসে ব্যস্ত ছিল মানবতার ধ্বজাধারী ইংরেজরা। মোটকথা, যুগটা ছিল ইসলামী সংস্কৃতির জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ। ইতিহাসের কঠিনতম এই টার্নিং পয়েন্টে উলামায়ে দেওবন্দের সামনে এই প্রয়োজনটি তীব্রভাবে অনুভূত হলো যে, ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার করাল গ্রাস থেকে নিরাপদ রাখা এবং মুসলমানদের দ্বীন ধর্মকে রক্ষা করে তাদেরকে ইরতেদাদের (স্বধর্ম ত্যাগ করা) অভিশাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। এই লক্ষ্য পূরণে তারা পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা এবং সাহসিকতার সাথে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারা প্রথমেই শত্রুদের গতিবিধি লক্ষ্য করে নিজেদের কোন ময়দানে লড়তে হবে, তা নির্ধারণ করলেন। এরপর নিজেদের সামর্থ্যের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে শত্রুদের প্রতিরোধে নেমে পড়লেন রণাঙ্গনে।

দারুল উলূম তার দেড় শত বছরের সংগ্রামী ইতিহাসে একদিকে উপমহাদেশের মুসলমানদের সামাজিক জীবনমান উন্নত করেছে, অন্যদিকে তাদের চিন্তা-চেতনাকেও শাণিত এবং মজবুত করতে সক্ষম হয়েছে। দারুল উলুম এমন একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠান, যে প্রতিষ্ঠান নতুন এবং পুরাতনের মাঝে চমৎকার সমন্বয় করে যাচ্ছে। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ লুধিয়ানভী (রহ.) দারুল উলুম দেওবন্দের চতুর্মুখী খেদমতকে তাজদীদে দ্বীন (ধর্মের সংস্কার) নামে অবিহিত করেছেন। তার ভাষায়, এগার শতাব্দীতে ধর্ম প্রচার এবং সংস্কারের কেন্দ্রে পরিণত হয় আমাদের উপমহাদেশ। স্ব-স্ব যুগে ভারতবর্ষে হেদায়েতের দ্যুতি ছড়িয়েছেন মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহ.) (৯৭১-১০৩৪ হি.), শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) (১১১৪-১১৭৬ হি.), শহীদে বালাকোট সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহ.) (মৃ. ১২৪৬ হি.)। দারুল উলুম দেওবন্দও প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তার পূর্বসূরিদের এই চেতনা বুকে ধারণ করেছে এবং তা ছড়িয়ে দিয়েছে সবার মাঝে। লোকেরা দারুল উলূমকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যায়ন করে থাকে। অনেকেই দারুল উলূমকে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের তীর্থভূমি মনে করে। আবার অনেকের দৃষ্টিতে এটা মুক্তি সংগ্রামের বীর সেনানীদের ট্রেনিং কেন্দ্র। অনেকেই এটাকে দাওয়াত-তাবলীগ এবং তাসাওফ-সুলুকের কেন্দ্রবিন্দু আখ্যা দিয়ে থাকেন। কিন্তু আমি দারুল উলূমকে সাইয়িদুত তায়িফা হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) (১২৩১-১৩১৫ হি.) এর ভাষায় 'দ্বীন ইসলাম রক্ষণাবেক্ষণের যুগোপযোগী মাধ্যম মনে করি। এটাকে অন্য ভাষায় এভাবেও বলা যায়, ইসলাম ধর্মে মুজাদ্দিদের (এই উম্মতের মাঝে মহান আল্লাহর নীতি চালু রয়েছে যে, প্রতি শতাব্দীতে একজন ধর্মীয় সংস্কারক মুজাদ্দিদে মিল্লাত আগমন করবেন, যিনি ধর্মের নামে প্রচলিত কুসংস্কার সামাজিক রুছুম-প্রথাকে মূলোৎপাটন করে তদস্থলে ধর্মীয় বিধান প্রতিষ্ঠা করবেন) যে পবিত্র ধারা পরম্পরা অব্যাহত রয়েছে, দারুল উলুম দেওবন্দ হচ্ছে সেই মুজাদ্দিদ তৈরির সূতিকাগার, প্রাণকেন্দ্র। মুজাদ্দিদে মিল্লাত হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) দারুল উলুম দেওবন্দেরই ফসল। সারা বিশ্বের আনাচে-কানাচে হেদায়েতের আলো ছড়িয়ে যাচেছ যে দাওয়াত-তাবলীগ, সেই তাবলীগের বীজও অংকুরিত হয়েছে এখান থেকে। মুক্তি সংগ্রামের বীর সেনানীদের আঁতুড়ঘরও এই দারুল উলুম। বিশ্ব বিবেককে নাড়িয়ে দেওয়া শ্রেষ্ঠ বিতার্কিক তৈরির প্রাণকেন্দ্রও এই দেওবন্দ। মাওলানা, আল্লামা, মুফতী, মুহাদ্দিস, ফক্বীহ, মুনাজির কি না তৈরি হচ্ছে দারুল উলূমে? সংক্ষিপ্ত কথা হচ্ছে, দারুল উলূম কিছু ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্ব জন্ম দিয়েছে, শুধু তা-ই নয়, বরং যুগশ্রেষ্ঠ অনেক প্রতিষ্ঠানই গড়ে উঠেছে দারুল উলূমের ছত্রচ্ছায়ায়। এজন্য দারুল উলূম দেওবন্দকে যদি ধর্ম প্রচার এবং সংস্কারের ইউনিভার্সিটি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, এটাই হবে তার চতুর্মুখী সেবার যথার্থ স্বীকৃতি।

(অবলম্বনে : মাসিক দারুল উলূম দেওবন্দ)

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত "লা-মাযহাবী ফিতনা প্রতিরোধে উলামায়ে কেরামের করণীয়" শীর্ষক ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রদত্ত সায়্যিদ মুফতী মাসূম সাকিব ফয়জাবাদী কাসেমী সাহেবের যুগান্তকারী তাকরীর

লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-৬

তাকলীদ ব্যতীত দ্বীনের ওপর চলা অসম্ভব :

অতি দীর্ঘ যে সাতকাহনের অবতারণা করলাম, তা শুধু এ কথাটি আপনাদের মানসপটে প্রোথিত করার জন্য যে, তাকলীদ ব্যতিরেকে দ্বীন মেনে চলাটা প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ের। যেমন কেউ যদি রুটি খেতে চায়, তাহলে তাকে ফসল ফলাতে হবে, সেগুলো মাড়াতে হবে, এসব স্তর অতিক্রম করেই শুধু তার রুটি খাওয়ার স্বাদ পূর্ণ হতে পারে। অন্যথায় রুটি খাওয়ার স্বপ্ন দেখাটা বোকার স্বর্গে বসবাস করারই নামান্তর।

এ জন্য ইসলামের স্বর্ণালি ইতিহাসে আপনি একটু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলেই দেখতে পাবেন যে, শিয়া সম্প্রদায় ও গুটিকয়েক লা-মাযহাবী ব্যতীত উম্মতে মুসলিমার প্রায় সকল পূর্ববর্তী ও পরবর্তী শরীয়ত বিশেষজ্ঞ এবং সর্বসাধারণ কোনো না কোনো মাযহাবের সাচ্চা অনুসারী ছিলেন এবং তা অকাট্য বলেও সাব্যস্ত করেছেন। বিশ্বের সকল মুফতী তো স্ব-স্ব মাযহাবের সুবাদেই সারা বিশ্বে পরিচিত ও সমাদৃত। এভাবে প্রায় সকল মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও যুগশ্রেষ্ঠ আলিমগণও কোনো না কোনো মাযহাবের সাথে সংশ্লিষ্ট আছেন। এ কথার ওপর প্রমাণ উপস্থাপন করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

যুগশ্রেষ্ঠ আলিমদের মাযহাব :

সিদ্দীক হাসান ভুপালী, লা-মাযহাবীদের অন্যতম পুরোধা। তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটির নাম, 'আল-হিত্তা ফী জিকরি সিহাহ আস সিত্তা'। তিনি সেখানে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, বিশ্বের খ্যাতনামা প্রায় মুহাদ্দিস, মুফাসসির, মুফতী কোনো না কোনো মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। আমি প্রায় বলি, তারা যেহেতু মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, তাই আমরাও মাযহাবের অনুসারী। বিবেচনার বিষয় হচ্ছে, তাকলীদের কারণে আমরা বড় মুশরিকে পরিণত হয়েছি, ফেকাহর অনুসরণ করা আমাদের জন্য অবৈধ বলে বিবেচিত হচ্ছে, তাহলে যে বিষয় আমাদের জন্য এত ভয়ানক পরিণতি ডেকে আনছে, তা তাদের জন্য কিভাবে পূর্ণতা এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হয়ে যায়? আমরা যে দোষে অপরাধী, তারা সে দোষে অভিযুক্ত হয়েও কিভাবে অভিযোগ থেকে বেকসুর খালাস পাচ্ছে? লা-মাযহাবীদের অন্যতম দিকপাল নবাব সিদ্দীক হাসান সাহেব পূর্ব যুগের কোন আলেম কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, তার একটা দীর্ঘ ফিরিস্তিও উপস্থাপন করেছেন। ইমাম বোখারী, ইমাম, মুসলিমসহ সবার মাযহাব উল্লেখ করেছেন। আল হিত্তা ফী জিকরি সিহাহ সিত্তার ২২৪ থেকে ২৮১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ইমামদের মাযহাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে ইমাম বোখারী (রহ.) কে শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ওই গ্রন্থে ইমাম বোখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাসাঈ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইবনে মাজাহ, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী, ইবনে তায়মিয়্যাহ, ইবনুল কাইয়ুম, মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব নজদী, মিশকাত প্রণেতা, ইমাম নববী, ইমাম বগভী, ইমাম খাত্তাবী, ইমাম তাহাবী, ইবনে আব্দুল বার, শায়খ আব্দুল ওয়াহাব, ইবনে বাত্তাল, ইবনে রজব, আল্লামা জরকশী, হাফেজ ইবনে মরজুকী, আল্লামা কাসতালানী, আল্লামা বুলায়কীনী, আল্লামা ইবনে আরবী, কাজী মুহিব্বুদ্দীন, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, আল্লামা হালবী, শায়খ ইবনে হাজর আসকালানী, আল্লামা শারানী, হাফেজ শামসুদ্দীন যাহাবী, ইবনুল জাওযী, আল্লামা সুয়ূতী, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী প্রমুখকে তিনি মুকাল্লিদ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। লা-মাযহাবীদের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার এই অর্থ নয় যে, অন্যদের দৃষ্টিতে তারা মুকাল্লিদ ছিলেন না, বরং তাদেরকে এই কথা স্বীকার করতে বাধ্য করানো, লা-মাযহাবীদের স্বীকৃত পুরোধারাও তাদেরকে মুকাল্লিদ হিসেবে অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। অন্যথায় তবকাত এবং আসমাউল রিজাল (বরেণ্যদের জীবনীতিহাস) সংক্রান্ত গ্রন্থগুলোতে এই কথা বারবার আলোচিত হয়েছে, তারা চার মাযহাবের কোনো না কোনো ইমামের সাচ্চা মুকাল্লিদ ছিলেন।

তাকলীদ : দ্বীন-ঈমান রক্ষার অন্যতম মাধ্যম :

বর্তমানে মুসলমানরা দুটি গ্রুপে বিভক্ত। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, তাকলীদ হলো দ্বীন এবং ঈমান রক্ষার অন্যতম মজবুত দুর্গ। আর লা-মাযহাবীদের বক্তব্য হলো, তাকলীদের চৌহদ্দিতে প্রবেশ করা আর ঈমানের গণ্ডি থেকে

বের হয়ে যাওয়া প্রায় সমার্থক। বর্তমান বিশ্বে এই দুটি মতাদর্শগত ভিন্নতা এবং বৈরিতা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। এই মতবিরোধ নিরসনকল্পে আমি আপনাদের সামনে অনেক গবেষণামূলক, তাত্ত্বিক প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছি, অথচ এ রকম উন্মুক্ত আলোচনায় এত বেশি প্রমাণাদি উপস্থাপন করতে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না। বরং বলতে পারেন তা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। আমি লোকদের সাথে কর্মক্ষেত্রে এবং আমলী ময়দানে কাজ করতে বেশি আগ্রহী। আমি বলি, ভাই, কাজের কথায় আসুন। আমরা দলিল-দস্তাবেজ দিয়ে সয়লাব করে ফেললাম, তারা তো হাত-পা গুটিয়ে নিরীহ প্রাণীর মতো বসে থাকবে না। বরং তাদের পক্ষ থেকেও প্রমাণাদির বন্যা বয়ে যাবে।

ফলাফল : শূন্য।

দাওয়াতের হেকমতে আমলি :

আপনি কোনো লা-মাযহাবী ভাইকে আন্তরিকতার সাথে জিজ্ঞেস করুন, আপনার ভাষ্য মতে, তাকলীদ করা সবচেয়ে বড় শিরক। ঠিক আছে, আপনার কথা মতে আমি তাকলীদ ছেড়ে দিতে সর্বান্তকরণে প্রস্তুত। তবে আপনাকে একটু কষ্ট স্বীকার করতে হবে। তা হলো, মানুষের জীবন হলো চলমান। এখানে স্থবিরতা বা অচলাবস্থার কোনো সুযোগ নেই। তাই মানুষের সামনে দৈনন্দিন উপস্থিত হচ্ছে হাজার-হাজার নিত্যনতুন সমস্যা। তখন কি আমরা আমাদের জীবনের অগ্রযাত্রার মিশন থামিয়ে দেব? না সম্মুখপানে বীরদর্পে এগিয়ে যাব? থেমে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে পরাজয় এবং অক্ষমতা, সুতরাং তা বাদ। তাই এগিয়ে যাব সম্মুখপানে। কিন্তু সমস্যার সমাধান? তাকলীদ যেহেতু আপনার ভাষ্য মতে বড় শিরক, তাই তা বাদ। এখন আপনাকে একটা ছোট্ট কাজ করতে হবে। তা হলো, আমাদের সমস্যার সমাধান রাসূলের এমন হাদীস দিয়ে দিতে হবে, যে হাদীস সহীহ (বিশুদ্ধ), সরীহ (স্পষ্ট), মুত্তাসীল (বর্ণনাকারীদের মাঝে কোনো বিচ্ছিন্নতা নেই), গায়রে মুআরিয (অন্য কোনো হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়)। তবে এ কথাও তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার, আমাদের সমস্যা কিন্তু শুধু নামাযের কয়েকটা মাসআলার (যেমন, বারবার হাত তোলা, ইমামের পেছনে কেরাত পড়া, উচ্চৈস্বরে আমীন বলা) ভেতর সীমাবদ্ধ নয়, বরং আমাদের সমস্যার পরিধি অনেক বিস্তৃত এবং প্রশস্ত। উদাহরণস্বরূপ, একটি সাধারণ মাসআলা জিজ্ঞেস করি, মশা সম্পর্কে। মশা পবিত্র না অপবিত্র? মশা মরে চা অথবা পানীয়দ্রব্যে পড়লে তার শরয়ী বিধান কী? মশার বিধান সরাসরি কুরআন-হাদীস থেকে কোনো কিয়াসের আশ্রয় নেওয়া ব্যতিরেকে বের করে দিলে আমরা কৃতার্থ হব। এ কথা যখন আপনি তাকে বলবেন, তখন সে অত্যন্ত প্রফুল্ল হয়ে মাছি, সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসটি আপনার সামনে তৎক্ষণাৎ উপস্থাপন করে দেবে। এখন সে মশার মাসআলাকে মাছির হাদীসের ওপর কিয়াস করতে বাধ্য। আফসোস! যে কিয়াসের সমালোচনা এবং বিষোদগার করতে করতে নিজের অমূল্য জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশই ব্যয় করে ফেলেছে, জীবনসায়াহ্নে এসে নিরুপায় হয়ে আবার আশ্রয় খুঁজতে হচ্ছে তারই কোলে! একেই বলে নিয়তি।

সে যখন কিয়াস করবে, তখন তাকে বিনীতভাবে বলুন, হযরত! আপনার সামনে তো মশা আর মাছির পার্থক্য অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। কারণ এটা তো গণ্ডমুর্খেরও জানা থাকার কথা। আপনি মাছির হাদীসকে মশার সাথে ফিট করে দিলেন! এটা কোন ধরনের জালিয়াতি? আমাদের অনেক রসিক আলেম বন্ধু বলে থাকেন, লা-মাযহাবীরা শরীয়তের বিষয়ে এতই বিশেষাজ্ঞ (বিশেষ + অজ্ঞ), মশা-মাছির মাঝে বিদ্যমান স্পষ্ট পার্থক্যও 'ইজতিহাদের গুণাবলিসম্পন্ন' তাদের অতিপ্রাকৃতিক (!) ব্রেইনে ধরা পড়ে না! অথচ উভয়টা আলাদা প্রাণী। রাসূল (সা.) সরাসরি মশার নাম উল্লেখ করে বিধান বর্ণনা করেছেন, এমন হাদীস উপস্থাপন করুন। তখন ধীরে ধীরে তাদের প্রকৃতস্পরূপ জনসাধারণের সামনে উন্মোচিত হয়ে যাবে।

একটি বাস্তব ঘটনা :

হিন্দুস্তানে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কয়েকজন লা-মাযহাবী আলেমকে নিজের ঘরে আমন্ত্রণ জানালেন। তারা বাড়িতে আসার পর তিনি তাদের জন্য চা-নাস্তার ব্যবস্থা করলেন। হঠাৎ ভরা মজলিশে এক যুবক একটা মশা মেরে চায়ের ফ্ল্যাক্সে ফেলে দিল। বাড়িতে একটা শোরগোল শুরু হয়ে গেল। যুবকটি বলল, এখন কি এক ফ্ল্যাক্স চা অপবিত্র আখ্যা দিয়ে ফেলে দেওয়া হবে? না এগুলো হালাল হিসেবে গণ্য হবে? কুরআন-হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে তার শরয়ী বিধান বর্ণনা করুন। এটি কোনো কাল্পনিক ঘটনা নয় বরং সম্পূর্ণ বাস্তব ঘটনা। যা হোক, পরিস্থিতি এতই ভয়ানক আকার ধারণ করল, ওই লা-মাযহাবী আলেমদের পিঠ বাঁচানোটাই দায় হয়ে উঠল। জনসাধারণের প্রশ্নবাণে তারা জর্জরিত হতে লাগল। তখন এক ব্যক্তি বললেন, ইমামদের বের করা মাসআলাগুলো সম্পর্কে বিষোদগার এবং সমালোচনা করা অতি সহজ, কিন্তু চা ঠাণ্ডা হওয়ার পূর্বে মশা চায়ে পড়লে তার শরয়ী বিধান

বের করা অতি কঠিন। কারণ তাকলীদ অস্বীকার করে তারা এমন একটা অযৌক্তিক মাপকাঠি নির্ধারণ করেছে, যার ওপর ভিত্তি করে মশার বিধান বের করা একেবারে অসম্ভব। রফয়ে ইয়াদাইনের মাসআলা নিয়ে গবেষণা করা অতি সহজ। কিন্তু মশার বিধান নিয়ে গবেষণা করা কোনো চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। এ জন্য আমাদের আলেমরা বলেছেন, সাথে একটা তালীমুল ইসলাম নিয়ে লা-মাযহাবীদের বড় বড় আলেমের কাছে যাও। ওই কিতাবের মাসআলাগুলো তাদের সামনে উপস্থাপন করে সে সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা পেশ করতে বলুন।

আমার নিজের একটা ঘটনা :

আমি একবার লা-মাযহাবীদের একজন মুজতাহিদকে (!) চিঠি লিখলাম, হযরত! আপনি তো আমাদের তাকলীদকে বড় শিরক আখ্যা দিয়ে থাকেন, তাহলে কুরআন-হাদীস থেকে সরাসরি যদি মহিষের বিধানটা আমাকে জানাতেন, তাহলে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকতাম। যেহেতু মহিষকে আরবী ভাষায় জামুছ বলা হয়। কুরআন-হাদীসের কোথাও জামুছের বিধান আছে কি না? জামুছের গোশত খাওয়া যাবে কি না? তার চামড়া ব্যবহারযোগ্য কি না? তার দুধের বিধান কী? প্রত্যেক বিষয়ের ওপর সুস্পষ্ট কুরআন-হাদীস পেশ করুন। তবে স্মরণ রাখবেন, ভুলেও যেন কিয়াসের অন্ধকার পথে পা না বাড়ান। কারণ, اول من قاس ابليس. (প্রথম কিয়াসকারী শয়তান) এই বাণী চিরন্তনীকে তো আপনারা কুরআন-হাদীসের চেয়ে বেশি জপতে থাকেন! কোনো ইমামের বক্তব্য নকল করার মতো অপরাধও যাতে না করেন! কেননা, আপনাদের বক্তব্য মতে, কোনো উম্মতের তাকলীদ করা সরাসরি শিরক! আপনি মহিষকে হালাল অথবা হারাম যা-ই বলুন না কেন, তা হতে হবে স্পষ্ট কুরআন-হাদীসের মাধ্যমে। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি এর দুধের বিধান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবেন না, ততক্ষণ এর দুধ পান করা থেকে বিরত থাকুন। কেননা এটা এখন আপনার কাছে সন্দেহজনক বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

বন্ধুরা! এই চিঠিটা পাঠিয়েছি কত দিন হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও উত্তর দেওয়ার কোনো গরজ পরিলক্ষিত হচ্ছে না, কিছু আছে গবেষণামূলক আলোচনা, যেগুলো আমাদের ক্লাসে তথা মাদরাসার পরিবেশে আলোচিত হয়। আর কিছু আছে হেকমতে আমলি, যেগুলো কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হয়। এ বিষয়ে আপনার ব্যুৎপত্তি এবং পারদর্শিতা যত গভীর হবে, আপনার চতুর্পাশে লোকদের ঈমান তত মজবুত হবে এবং তারা সহজেই শত্রুদের জালে আটকা পড়বে না। একজন মানুষের ঈমান-আক্বীদা বিশুদ্ধ এবং নির্ভেজাল রাখতে পারা, একজন মুমিনের জন্য এর চেয়ে বড় হিতকামনা হতেই পারে না। আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি, লা-মাযহাবীরা সাধারণত উগ্রপন্থী হয়ে থাকে। প্রথিতযশা পূর্বসূরিদের সম্পর্কে বিষোদগার করতে তাদের একটুও বাধে না। ইয়াকীনের মহাদৌলত খুইয়ে তারা হাতড়াতে থাকে সন্দেহ সংশয়ের কূলকিনারাহীন কণ্টকাকীর্ণ পিচ্ছিল পথে। যেখানে প্রতি পদে পদে পা পিছলে গভীর খাদে পড়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।

পূর্ণাঙ্গ নামায বনাম অপূর্ণাঙ্গ নামায :

ইসলাম ধর্মে ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হচ্ছে নামায। নামায শুধুমাত্র রফয়ে ইয়াদাইন, আমীন, কেরাত খালফাল ইমাম, হাত কোথায় বাঁধবে এগুলোর নাম নয়। বরং এগুলো হচ্ছে নামাযের কিছু অংশ মাত্র। নামাযের একটা পূর্ণাঙ্গরূপ আছে, যেটার সূচনা হয় পবিত্রতা এবং তাকবীরে তাহরীমার মাধ্যমে এবং যেটার পরিসমাপ্তি ঘটে সালামের মাধ্যমে। কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে, আমাদের লা-মাযহাবী বন্ধুরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামায বলতে পূর্বে উল্লিখিত কয়েকটি বিষয়কেই বুঝে থাকেন, যেগুলোর সমন্বয় করলে নামাযের একটি অপূর্ণাঙ্গরূপ তৈরি হয়, যা কখনো আল্লাহর শাহী দরবারে গৃহীত হয় না। আমরা লা-মাযহাবী বন্ধুদের কাছে অত্যন্ত বিনয় এবং শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি, নামাযের আদ্যোপান্ত তথা একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, তাকবীরে তাহরীমা থেকে সালাম পর্যন্ত প্রতিটি অংশকে কুরআন-হাদীসের এমন বর্ণনা দিয়ে প্রমাণিত করুন, যেমন বর্ণনা দিয়ে রফয়ে ইয়াদাইন প্রমাণ করতে চেষ্টা করে থাকেন। এর জন্য তোমাদের মুহাম্মদ জোনাগড়ীর তাফসীরে কুরআন এবং ওয়াহীদুজ্জামান হায়দারাবাদীর হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সামনে রাখুন। আমরা তোমাদেরকে প্রশ্ন করব, তোমরা কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট বাণীর আলোকে তার উত্তর দিতে থাকবে। যেখানে সুস্পষ্ট বাণী পাবে না, সেখানে ক্ষান্ত হও। সর্বশেষে এই সিদ্ধান্ত দিয়ে দাও, নামাজের এসব বিষয় কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, যদি বিশুদ্ধ নামায পড়তে চাও, তাহলে কোনো না কোনো ইমামের ফিকাহর আশ্রয় অবশ্যই নিতে হবে। এ ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। এ জন্য আমাদের মূলনীতি হলো, নামায হাদীস অনুযায়ী পড়া জরুরি নয়, বরং নামায সুন্নাত অনুযায়ী হওয়াটাই জরুরি। আর সুন্নাত অনুযায়ী নামায ফুকাহায়ে কেরাম

সুবিন্যস্তভাবে সংকলন করেছেন, যার শুরু হয় তাকবীরে তাহরীমার মাধ্যমে, আর সমাপ্ত হয় সালামের মাধ্যমে। ফুকাহায়ে কেরাম আবার প্রত্যেক মাসআলাকে দলিল-প্রমাণ দিয়ে প্রমাণিত করেছেন। এখন লা-মাযহাবী বন্ধুরা যে নামাযের গুটিকয়েক মাসআলা নিয়ে পুরো উম্মাহর ঐক্য এবং সংহতি বিনষ্ট করছে তা কখনো দ্বীনের খেদমত হতে পারে না।

আরেকটি সহজ উদাহরণ :

বিষয়টি সবার বোধগম্য হওয়ার জন্য আমি আরেকটি সহজ উদাহরণ দিয়ে থাকি। কুরআনে বলা হয়েছে, *وارکعوا واسجدوا* তোমরা রুকু করো এবং সিজদা করো। এই আয়াত থেকে নামাযে রুকু এবং সিজদা ফরজ হওয়াটা বোঝা যায়। কিন্তু নামাযে রুকু একটা এবং সিজদা দুটি এটার উৎস কোথায়? একই ধরনের শব্দ, কিন্তু একটা শব্দ থেকে একটা রুকু এবং অন্য শব্দ থেকে দুটি সিজদা এটা কিভাবে সম্ভব? কুরআনে এমন কোনো আয়াত দেখাও, যেখানে দুই সিজদার কথা বিবৃত হয়েছে। তোমরা কুরআন অনুযায়ী চলে থাকো, এই আওয়াজটা সারা বিশ্বে ঢোল-তবলা বাজিয়ে প্রচার করে থাকো, তাহলে নামাযে একটা সিজদা এবং একটা রুকু দাও। কারণ কুরআনে এতটুকুই আছে। তাহলে বোঝা গেল, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঠিক অনুসরণ ব্যতিরেকে একজন মুমিনের জন্য সামনে এক কদমও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।

একটি ঘটনা :

আপনাদেরকে একটি ঘটনা শোনাচ্ছি, যে ঘটনা পূর্বের সফরেও এই মসজিদে হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত দা.বা. এর নির্দেশে আপনাদেরকে শুনিয়েছিলাম। হিন্দুস্তানে লা-মাযহাবীদের সাথে একবার আমাদের মোনাজারা (বিতর্কানুষ্ঠান) অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা আব্দুল বাসিত নামে তাদের একজন বড় মাওলানা ছিলেন, যিনি একটা বড় প্রসিদ্ধ মাদরাসার শায়খুল হাদীস ছিলেন তাঁর ইলম এবং জ্ঞানের সুখ্যাতি ও সুনাম দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। লোকমুখে তাঁর কথা শুনতে শুনতে তাকে আমি অনেক বড় আলেম মনে করতাম। কিন্তু যখন সরাসরি তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করলাম, তখন বুঝতে পারলাম, উপরে ফিটফাট, ভেতরে সদরঘাট। তাঁর কাছে একগুঁয়েমী এবং অনর্থক বাচালতা ছাড়া ইলমের খুব একটা লক্ষণ দেখা যায়নি। আমি রসিকতা করে বলে থাকি, তোমরা ইলম থেকে যোজন-যোজন দূরত্বে আছ। হিন্দুস্তানের বিদআতীরা বলে, আমরা গাউসুল আজমের আঁচল ধরে থাকব। তা কিছুতেই ছাড়ব না! তাদের তো কিছু না কিছু হলেও আছে। আমাদের দেশে বলে, নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো! কিন্তু তোমাদের তো কিছুই নেই!

আমি ওই মাওলানাকে বললাম, কালেমায়ে তাইয়েবা لا اله الا الله محمد رسول الله আপনারা স্বীকার করেন কি না? আমাদের সম্পর্কে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, কারণ আমরা তো মুকাল্লিদ। কোনো ইমামের বর্ণনা পেলে, কিংবা কোনো তাবেয়ীর উক্তি পেলে তা-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আমরা কিছু মূলনীতির অনুসরণ করে থাকি। কিন্তু তোমরা তো আমাদের মূলনীতিকে শিরক আখ্যা দিয়ে থাকো। আপনাকে একটা প্রশ্ন করি। এই কালেমায়ে তাইয়িবা কোন হাদীসে সহীহ, মারফু, মুত্তাসিল, গাইরে মুআরিয দিয়ে প্রমাণিত করুন। শব্দ হবে لا اله الا الله محمد رسول الله হুবহু এ ধরনের। হাদীসের মর্মার্থ হবে এ ধরনের, রাসূল (সা.) মুসলমানদেরকে জীবদ্দশায় অথবা মৃত্যুর সময় এই কালেমায়ে তাইয়িবা পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। খেয়াল করুন, প্রশ্নে তিনটা অংশ। (১) হাদীস হবে সহীহ, মারফু, মুত্তাসিল এবং গায়রে মুআরিয। (২) শব্দ এবং বাক্যের গঠন হুবহু আমাদের প্রচলিত কালেমা হতে হবে। (৩) মর্ম হবে এ ধরনের, রাসূল (সা.) ঈমানদারদেরকে মুত্যুর সময় অথবা জীবদ্দশায় এই কালেমা পড়ার আদেশ দিয়েছেন। এসব শর্ত অনুসারী আপনারা যদি কালেমায়ে তাইয়িবা প্রমাণ করতে না পারেন তাহলে একটা মাসআলা বলুন। মাসআলা হলো, মৃত্যুর সময় কালেমায়ে তাইয়িবা পাঠ করা বৈধ না অবৈধ? সুন্নাত, মুস্তাহাব, ওয়াজিব না ফরজ? অর্থাৎ এর বিধান কী? এক ব্যক্তি মৃত্যুর সময় দলিল-প্রমাণ ছাড়া কালেমায়ে তাইয়িবা পাঠ করে মারা যাচ্ছে, সে কি মুশরিক হয়ে মারা যাচ্ছে, না তার মৃত্যু হচ্ছে ঈমানের ওপর? সে তৎক্ষণাৎ বলবে, ঈমানের ওপর তার মৃত্যু হচ্ছে। কারণ হাদীস শরীফে আছে,

من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة

দেখুন, এই হাদীস দিয়ে দলিল উপস্থাপন করা আমাদের জন্য অত্যন্ত যৌক্তিক। কারণ, আমরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ থেকে উদ্দেশ্য কালেমায়ে তাইয়িবাই মনে করি। যে কালিমার কথা অন্য হাদীসে এভাবে বিবৃত হয়েছে।

من قبل منى كلمة عرضتها على عمى فردها فهى له نجاة

তাই প্রথম হাদীস থেকে কালেমায়ে তাইয়িবাই উদ্দেশ্য, এই কথা বলা আমাদের জন্য অত্যন্ত সহজ। কিন্তু বিপত্তি হচ্ছে তাদের জন্য, যারা প্রত্যেক মাসআলায় কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট প্রমাণ খুঁজে বেড়ায়। আমরা তাদের লাগামহীন মুখে লাগাম দেওয়ার জন্য

বলে থাকি, যে কালেমায়ে তাইয়িবার সাথে ঈমানের এমন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, সে কালেমায়ে তাইয়িবাকে উপরোল্লেখিত শর্তের কথা মাথায় রেখে প্রমাণ করুন।

কমপক্ষে দুই রাকা'আত নামায ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, নামায ভঙ্গের কারণসহ প্রমাণ করুন। যদি তাতে আপনারা বিজয়কেতন উড়াতে পারেন তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা দ্বিধাহীনচিত্তে আপনাদের তাকলীদ শুরু করব। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো লা-মাযহাবী আলেম এই 'পবিত্র' কাজের জন্য অগ্রসর হননি।

আমি লা-মাযহাবীদেরকে প্রায় বলে থাকি, তোমরা তাকলীদকে শিরক আখ্যা দিয়ে থাকো। আচ্ছা, কোনো ইমামের তাকলীদ করা ব্যতিরেকে দুই রাকা'আত নামায তোমরা পড়ে দেখাও।

এক লা-মাযহাবী আলেমের ঘটনা :

হিন্দুস্তানে গুলবার্গা নামে একটা প্রসিদ্ধ শহর আছে। সেখানে এক লা-মাযহাবী আলেম আলোচনার শীর্ষে চলে এলেন। তিনি সেখানে বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। প্রথম প্রথম তিনি শুধু সামাজিক বিধিবিধান এবং সবার কাছে গ্রহণযোগ্য মাসআলা বয়ান করতেন। মতানৈক্য বিষয়গুলো সচেতনতার সাথে এড়িয়ে যেতেন।

আমাদের বড় ভুল :

এ অবস্থায় আমরা ধোঁকা এবং প্রবঞ্চনায় পড়ে যাই, এই লোকটি মতবিরোধপূর্ণ বিষয় এড়িয়ে যাচ্ছে, সুতরাং তার বক্তৃতা শুনতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু জনসাধারণ যখন তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল হয়ে যাবে এবং তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়বে, তখন ধীরে ধীরে তার ভদ্রতার খোলস খুলে যাবে। উন্মোচিত হবে তার স্বরূপ। ওই মৌলভী যখন দেখতে পেল যে, জনসাধারণ তার জালে ফেঁসে গেছে, তখন সে তার মিশনে নেমে পড়ল। মাযহাবীদের বিরুদ্ধে তার চূড়ান্ত ক্ষোভ ঝরতে লাগল তার বয়ান বক্তব্যে। কিছু লোক তো সম্পূর্ণ লা-মাযহাবী হয়ে গেল। তিনি ঘোষণা দিয়ে রেখেছিলেন, আপনাদের যেকোনো জটিল প্রশ্নের উত্তর কুরআন-হাদীসের আলোকে প্রদান করা হবে।

তিনি যখন বক্তৃতা দিতেন, তখন তার লোকেরা তাকে বিভিন্ন কমন প্রশ্ন করত। সেগুলোর উত্তর যেহেতু তার কাছে ডাল-ভাতের মতো, সে ঝটপট তার উত্তর দিয়ে দিত, উত্তর শুনে পুরো মজলিসে ধন্য ধন্য রব উঠত। একদিন আমাদের আক্বীদার এক ছোট্ট বাচ্চা সে মজলিসে গিয়ে একটি প্রশ্ন করল, সে জানতে চাইল, মাওলানা! নামাজের তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়ার বিধান কী? যেসব লোক তার পক্ষ থেকে দালাল হিসেবে মজলিসে উপস্থিত ছিল, তাদের মধ্যে কানাঘুষা আরম্ভ হয়ে গেল! পিচ্চিটা কে? একে তো আগে কখনো দেখা যায়নি? তাদের 'সবজান্তা' 'মুজতাহিদ' মাওলানার জ্ঞানের পরিধি যেহেতু শুধু রফয়ে ইয়াদাইন, আমীন বিল জেহের, কেরাত হাত বাঁধার মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল, এখন তিনি তাশাহহুদ সম্পর্কে কী না কী বলে ফেলেন! গোমর ফাঁস হয়ে গেলে পেটে ভাতে চলায় দায় হয়ে পড়বে! তাদের চিন্তায় ছেদ পড়ল। মাওলানা বললেন, নামাযে তাশাহহুদ পড়া জরুরি (অত্যাবশ্যকীয়)। ছেলেটি বলল, মাওলানা! জরুরি তো উর্দু শব্দ! শরীয়তের কোন পরিভাষা বললে সহজে বোধগম্য হতো? মাওলানা বললেন, ওয়াজিব। ছেলেটি বলল, ঠিক বলেছেন। তবে এর স্বপক্ষে প্রমাণটা দিলে আমরা কৃতার্থ হতাম। তখন ওই মাওলানা দ্বিধাহীনচিত্তে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর সূত্রে বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদীসটি পড়ে শোনালেন। ছেলেটি বলল, উচ্চ আওয়াজে পড়তে হবে না নিম্নস্বরে? মাওলানার উত্তর, নিম্নস্বরে পড়তে হবে। ছেলেটি বলল, আপনার উপস্থাপনকৃত হাদীসে ছোট করে পড়ার কথা বলা হয়নি। আপনি এই কথাটা কিসের ওপর ভিত্তি করে বললেন? মাওলানার উত্তর, এটাই উম্মাহর ধারাবাহিক কর্মপরম্পরা। ছেলেটি চোখে-মুখে বিস্ময়ভাব ফুটিয়ে বলতে লাগল, আপনার কাছে কুরআন-হাদীস থাকার কথা! তাওয়ারুছ (উম্মাহর ধারাবাহিক কর্মপরম্পরা) এটা আবার কী? এটা আবার কোন ইমাম? আমরা তো ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী প্রমুখ ইমামের নাম শুনেছি। কিন্তু তাওয়ারুছ নামক কোনো ইমামের নাম আজ পর্যন্ত শুনলাম না! তখন ইমাম সাহেবের অবস্থা অত্যন্ত করুণ এবং শোচনীয়। হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, সে যেন এই পিচ্চিটাকে আস্ত গিলে খাবে। এদিকে মুরীদদের অবস্থা আরো সঙ্গীন। কারণ প্রশ্নকারী একজন পিচ্চি! আর উত্তরদাতা তাদের 'সবজান্তা'। পিচ্চিটার আওয়াজ তখন কানে যেন গরম সিসা ঢেলে দিচ্ছিল। তার থামার নাম-গন্ধ দেখা যাচ্ছে না। সে অনবরত বলেই যাচ্ছে, আমরা আত্তাহিয়্যাতু উচ্চৈস্বরে পড়তে চাই। আপনি নিষেধ করতে চাইলে কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট প্রমাণাদি উপস্থাপন করুন। কারণ এটা তো যে আপনারই 'মহান শিক্ষা'। ঘটনার ইতি কী হবে, তা তো বুঝতেই পারছেন! এখান থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হলো, জ্ঞানী লোকদের সাথে কথা বলার সময় অবশ্যই ইলমী বিষয় আসা উচিত। কিন্তু জনসাধারণের ফিল্ডে যখন আপনি কাজ করবেন, তখন তাদের পরিভাষায়

তাদের সাথে কথা বলতে হবে। তাদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। তাদেরকে নিজেদের মানসিকতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে হবে। বিশেষ করে তরুণ যুবকদেরকে নিজেদের হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা এবং আন্তরিকতা উজাড় করে দিয়ে তৈরি করতে হবে। তবে এসব ক্ষেত্রে যে বিষয়কে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে, তা হলো, আপনার শ্রেষ্ঠ চরিত্র। আপার চরিত্রমাধুরী যেন যে কাউকে মোহিত করে। শত্রু-মিত্র সবার কাছে যেন আপনি প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। কোনো লা-মাযহাবী আলেম যদি আপনার কাছে আসে তার সাথেও কথা বলুন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো। ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই। আপনার কাছে যদি কিতাব নাও থাকে, কিংবা কোনো প্রস্তুতিও না থাকে তাও তাকে আপনি শরীয়তের বিধিবিধানের শ্রেণীবিন্যাস নিয়ে আটকাতে পারেন। তাকে জিজ্ঞেস করুন। রফয়ে ইয়াদাইন কী? সে নিঃসঙ্কোচে বলবে, সুন্নাত। অনেক গণ্ডমূর্খ তো ওয়াজিব পর্যন্ত বলেছে। পুনরায় জিজ্ঞেস করুন, ছেড়ে দেওয়া কী? সে বলবে, বিদআত। তখন আপনি একটু হতভম্ব হয়ে পড়বেন। কারণ এত দিন শুনে এসেছেন, অমুক কাজ করা বিদআত। কিন্তু এ কথা কস্মিনকালেও শোনেননি, অমুক কাজ ছেড়ে দেওয়া বিদআত। তাকে আবার জিজ্ঞেস করুন, আমরা প্রথমবার যে রফয়ে ইয়াদাইন করি, এর দ্বারা কি সুন্নাত আদায় হবে? না সুন্নাত আদায় হওয়ার জন্য প্রত্যেক রাকা'আত আলাদা আলাদা করতে হবে? অর্থাৎ রফয়ে ইয়াদাইন কিসের সুন্নাত? প্রত্যেক নামাজের সুন্নাত? না প্রত্যেক রুকুর সুন্নাত? না প্রত্যেক ওঠাবসার সুন্নাত? যেটাই বলুক না কেন? তার স্বপক্ষে কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্য পেশ করুন? এটা বলে দেবেন যে, ওই হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো হাদীস যেন না থাকে।

বিহারের একটি ঘটনা :

বিহারের একটি প্রসিদ্ধ এলাকায় একবার আমাদের অনুষ্ঠান হচ্ছিল, সেখানে আমি লোকদেরকে এ কথাই বলছিলাম, রফয়ে ইয়াদাইন করা সুন্নাত। তবে প্রথমবার করার দ্বারা পুরো নামাযের জন্য তা যথেষ্ট হয়ে যাবে। কারণ যেসব বিষয় ইসলামের শি'আর হিসেবে চিহ্নিত, সেসব বিষয়ে পুনরুক্তি নেই। যেমন, আযান, ইকামাত যেহেতু ইসলামের শি'আর, তাই সেগুলোতে তাকরার বা পুনরুক্তি নেই। কিন্তু জনসাধারণ যেহেতু ইকামাত, আযান সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝতে পারবে না, তাই তাদেরকে সহজবোধ্য করার জন্য আরেকটি উদাহরণ দিই। খাতনা করা সুন্নাত। বারবার না একবার? সবাই সমস্বরে বলে উঠল, একবার। একই অবস্থা রফয়ে ইয়াদাইনেরও। এভাবে কোনো পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াও আপনি তাদের সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে পারবেন। আর যদি পূর্বপ্রস্তুতি থাকে, তাহলে তো তাদের জন্য পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় থাকবে না ইনশাআল্লাহ।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

গ্রন্থনা ও অনুবাদ
হাফেজ রিদওয়ানুল কাদির উখিয়াভী।

চশমার জগতে যুগ যুগ ধরে বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত

মেহবুব অপটিক্যাল কোং

এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।
পাইকারি ও খুচরা দেশি-বিদেশি চশমা সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হয়।

১২ পাটুয়াটুলি রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন : ০২- ৭১১৫৩৮০ , ০২- ৭১১৯৯১১

১৩ গ্রীন সুপার মার্কেট, গ্রীন রোড, ঢাকা-১২১৫। ফোন : ০২-৯১১৩৮৫১

মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার-৫

মাও. ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী

৩. ইসলামী সমাজব্যবস্থা একদিকে যেমন ব্যক্তিকেন্দ্রিক, অন্যদিকে তা সমাজ ও রাষ্ট্রকেন্দ্রিক। ব্যক্তিজীবনে কারও পক্ষে আস্তে কিংবা জোরে আমীন বলা সম্ভব হলেও রাষ্ট্র কিংবা সমাজব্যবস্থা কখনও দোদুল্যমান বিধানের ওপর টিকে থাকে না। যেমন, বিচারক যদি কোনো বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং তা যদি কুরআন ও হাদীসের আলোকে হয়ে থাকে, তবে অন্য কোনো আলেম গিয়ে তার ভুল ধরে বিচারব্যবস্থা নড়বড়ে করার সুযোগ পাবেন না এবং একই মাসআলায় ত্রিমুখী সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন না। বিচারের ফয়সালা বা রায় একটিই হয়ে থাকে। এ জন্য ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে যাদের ন্যূনতম ধারণা আছে, তারা অবশ্যই জানেন যে, পৃথিবীতে একেক অঞ্চলের বিচারব্যবস্থা চার মাযহাবের কোনো একটির আলোকে পরিচালিত হতো। এখানে যদি যেমন খুশি তেমন চলার সুযোগ দেওয়া হতো, তবে খুব সহজেই ইসলামী সমাজব্যবস্থা ভঙ্গুর হয়ে পড়ত। কেননা দোদুল্যমান বিষয়ের ওপর কখনও রাষ্ট্রব্যবস্থা টিকে থাকে না।

৪. চার মাযহাবে মূলত কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মাসআলা বের করার ক্ষেত্রে সাহাবীদের উক্তি, সাহাবীদের আমল, তাবেঈ ও তবেতাবেঈগণের উক্তি ও আমলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এ জন্য সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যে বিষয়ে একমত (ইজমা) হয়েছেন, চার মাযহাব সেটিকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে গ্রহণ করেছে। একইভাবে সাহাবা, তাবেঈ ও তবেতাবেঈগণের মাঝে কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য হলে চার মাযহাবেও দেখা যায় সেক্ষেত্রে মতপার্থক্য বিদ্যমান। মূলত যে সমস্ত বিষয়ে চার মাযহাবে মতানৈক্য হয়েছে, তার অধিকাংশ মতভেদ সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মাঝে ছিল। এখন যে সমস্ত তথাকথিত আহলে হাদীস বা সালাফীগণ মাযহাবীদেরকে গালি দিয়ে থাকেন, তাদের এতটুকু বোঝা উচিত যে, এই গালিটা মূলত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কে দেওয়া হলো না, এটি স্বয়ং রাসূল (সা.) কে অথবা কোনো সাহাবী (রা.) কিংবা কোনো তাবেঈকে দেয়া হলো। কেননা চার ইমামের কোনো ইমামই প্রমাণ ছাড়া কোনো মাসআলা প্রণয়ন করতেন না। সেই প্রমাণটি যদি রাসূল (সা.)-এর কোনো হাদীস হয়ে থাকে, তাহলে ইমামকে গালি দেয়ার অর্থ হলো, স্বয়ং রাসূল (সা.) কে গালি দেওয়া। আর যদি প্রমাণটি কোনো সাহাবী কিংবা কোনো তাবেঈর বক্তব্য হয়, তাহলে ইমামকে গালি দেওয়ার অর্থ হলো, সাহাবী কিংবা তাবেঈকে গালি দেওয়া।

৫. চার মাযহাব অনুসরণের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো, "আমলে মুতাওয়ারিছা" তথা রাসূল (সা.)-এর যুগ, তার পরবর্তী যুগ ও তার পরবর্তী যুগ থেকে যে বিধানটি মানুষের মাঝে গৃহীত ও সমাদৃত হয়ে এসেছে, যার ওপর মানুষ আমল করে আসছে, চার ইমাম কুরআন ও সুন্নাহের পাশাপাশি এ আমলে মুতাওয়ারিছার প্রতি দৃষ্টি রেখেই মাসআলা প্রণয়ন করেছেন। ইসলামে আমলে মুতাওয়ারিছার গুরুত্ব অপরিসীম।

এ প্রসঙ্গে হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.) বলেছেন-

خذوا من الرأى ما كان يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم

"অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের মতের অনুরূপ মতো তোমরা গ্রহণ করো, কেননা তারা তোমাদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী ছিলেন।" (ফাযলু ইলমিস সালাফ আলাল খালাফ, পৃষ্ঠা-৯)

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহ.) বলেছেন,

أما الأئمة و فقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث إذا كان معمولا به عند الصحابة و من بعدهم أو عند طائفة منهم فأما ما اتفق على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه على علم أنه لا يعمل به

"ইমামগণ এবং হাদীস বিশারদ ফকীহগণ কোনো একটি হাদীস সহীহ হলে তার ওপর তখনই আমল করেন, যখন কোনো সাহাবী, তাবেঈ, অথবা তাদের নির্দিষ্ট কোনো একটি দল তার ওপর আমল করে। আর সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যে হাদীসের ওপর আমল না করার ওপর একমত হয়েছেন, তার ওপর আমল করা জায়েয নেই, কেননা তার ওপর যে আমল করা যাবে না, সেটা জেনেই তারা হাদীসটি পরিত্যাগ করেছেন।"

আল্লামা ইবনু আব্দিল বার (রহ.) তাঁর বিখ্যাত কিতাব "জামেউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি" তে ইমাম মালেক (রহ.)-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন-

أصحاب أبى حنيفة -فإن كان ما هؤلاء على الحق :فقد كان الرشيد فيما يختار لك على الخطأ، وإن كان الرشيد على الصواب :فينبغى لك أن تنفى عنك أصحاب الخطأ.

"অর্থাৎ এই হাদীসগুলো আমি আপনার সাথে সে সমস্ত মুহাদ্দিসের নিকট থেকে শুনেছি, যাদেরকে হারুনুর রশিদ আপনার জন্য নির্বাচিত করেছিলেন। অথচ আপনার সভাসদবর্গ এ সমস্ত হাদীসের বিরোধিতা করে। (এর দ্বারা তিনি ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর অনুসারীদেরকে উদ্দেশ্য নিয়েছেন) এখন এরা যদি সঠিক হয়, তবে খলিফা হারুনুর রশিদ আপনার জন্য যে সমস্ত মুহাদ্দিস নির্বাচিত করেছিলেন, তারা ভুল সাব্যস্ত হবে। আর যদি খলিফা হারুনুর রশিদ কর্তৃক নির্বাচিত মুহাদ্দিসগণ সত্যের ওপর থাকে, তবে এদেরকে আপনার দরবার থেকে বের করে দেয়া উচিত।"

অতঃপর বাদশাহ মামুন কিতাবটি তাঁর নিকট থেকে গ্রহণ করে বললেন,

لعل للقوم حجة و أنا سائلهم عن ذلك.

"হয়তো তাদের নিকট কোনো শক্তিশালী দলিল রয়েছে, এ সম্পর্কে আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করব।"

অতঃপর তিনি ঈসা ইবনে হারুন (রহ.) প্রদত্ত কিতাবটি একের পর এক তিন ব্যক্তিকে দিলেন। কেউ তাকে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারল না।

সংবাদটি ঈসা ইবনে আবান (রহ.)-এর কাছে পৌঁছল। তিনি ইতিপূর্বে খলিফা মামুনুর রশিদের দরবারে আসতেন না। এ ঘটনা শুনে তিনি "আল-হুজ্জাতুস সগির" নামে একটি কিতাব রচনা করেন, যাতে তিনি হাদীসের প্রকারভেদ, হাদীস কিভাবে বর্ণিত হয় এবং কোন

النَّاسَ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ وَمَا اخْتَارَ كُلُّ أَهْلِ بَلَدٍ لِأَنْفُسِهِمْ ، فَقَالَ :لَعَمْرِى لَوْ طَاوَعْتَنِى عَلَى ذَلِكَ لَأَمَرْتُ بِهِ "

"আমিরুল মুমিনীন! আপনি এটি করবেন না! কেননা মানুষের নিকট পূর্বেই অনেক মতামত পৌঁছেছে, তারা অসংখ্য হাদীস শ্রবণ করেছে, অসংখ্য হাদীস বর্ণনা করেছে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট যে ইলম পৌঁছেছে, তারা তা গ্রহণ করেছে এবং তার ওপর আমল করে এসেছে। সাহাবা (রা.) ও অন্যদের মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলোকে তারা তাদের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করেছে। সুতরাং তাদেরকে তাদের অবস্থান থেকে বিরত রাখা কঠিন। অতএব মানুষকে আপনি তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিন এবং প্রত্যেক শহরের অধিবাসীরা যা গ্রহণ করেছে তার ওপর তাদেরকে থাকতে দিন।"

খলিফা বললেন, "আমার জীবনের শপথ! তুমি যদি আমাকে উদ্বুদ্ধ করতে তবে আমি অবশ্যই তার নির্দেশ দিতাম।" (অর্থাৎ "মুয়াত্তা" নামক কিতাবের ওপর আমল করতে বাধ্য করতাম)

جامع بيان العلم، وابن سعد (৬৬০৬) وغيرهما وهى صحيحة

"আখবারু আবি হানিফা ও আসহাবিহী" নামক গ্রন্থে রয়েছে–একদা ঈসা ইবনে হারুন (রহ.) আব্বাসীয় খলিফা মামুনের নিকট একটি কিতাব নিয়ে এলো, যাতে বেশ কিছু হাদীস লেখা ছিল। তিনি এসে বললেন,

هذه الأحاديث سمعتها معك من المشايخ الذين كان الرشيد يختارهم لك، و قد صارت غاشية مجلسك الذين يخالفون هذه الأحاديث -يريد

"ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, খলিফা আবু জা'ফর মানসুর যখন হজ সমাপ্ত করলেন, তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট হাদীস বর্ণনা করলাম। তিনি আমাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করলেন, আমি সেগুলোর উত্তর প্রদান করলাম। খলিফা আবু জা'ফর মানসুর বললেন-

فَقَالَ :إِنِّى قَدْ عَزَمْتُ أَنْ آمُرَ بِكُتُبِكَ هَذِهِ الَّتِى وَضَعْتَهَا -يَعْنِى الْمُوَطَّأَ - فَيُنْسَخَ نُسَخًا ثُمَّ أَبْعَثُ إِلَى كُلِّ مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا نُسْخَةً وَآمُرُهُمْ أَنْ يَعْمَلُوا بِمَا فِيهَا لَا يَتَعَدَّوْنَ إِلَى غَيْرِهِ ,وَيَدَعُونَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ الْمُحْدَثِ ؛ فَإِنِّى رَأَيْتُ أَصْلَ الْعِلْمِ رِوَايَةَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَعِلْمَهُمْ،

"আমি সংকল্প করেছি, আপনার লিখিত এই কিতাব অর্থাৎ মুয়াত্তার অনেকগুলো অনুলিপি তৈরি করার নির্দেশ দেব, তারপর মুসলমানদের প্রতিটি শহরে একটি করে অনুলিপি পাঠিয়ে দেব। আমি তাদেরকে আদেশ করব যে, তারা যেন এ কিতাবে যা সংকলন করা হয়েছে, শুধু তার ওপরই আমল করে এবং অন্য কোনো কিছু গ্রহণ না করে। এবং এ কিতাবের ইলম ব্যতীত অন্য কোনো ইলম গ্রহণ না করে। কেননা আমি দেখেছি, ইলমের মূল হলো, মদীনাবাসীর বর্ণনা ও তাদের ইলম।"

খলিফা আবু জা'ফর মানসুরের এ কথা শুনে ইমাম মালেক তাঁকে বললেন,

فَقُلْتُ " :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ سَبَقَتْ إِلَيْهِمْ أَقَاوِيلُ وَسَمِعُوا أَحَادِيثَ وَرَوَوْا رِوَايَاتٍ وَأَخَذَ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا سَبَقَ إِلَيْهِمْ وَعَمِلُوا بِهِ وَدَانُوا بِهِ مِنَ اخْتِلَافِ النَّاسِ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم -وَغَيْرَهُمْ ، وَإِنَّ رَدَّهُمْ عَمَّا اعْتَقَدُوهُ شَدِيدٌ ، فَدَعِ

হাদীস গ্রহণযোগ্য এবং কোন হাদীস পরিত্যাজ্য, পারস্পরিক বিরোধী হাদীসের মুখোমুখি হলে আমাদের করণীয় কী এবং এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ তিনি উল্লেখ করেন, অতঃপর প্রত্যেক হাদীসের জন্য একটি অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ তৈরি করেন এবং প্রত্যেক পরিচ্ছেদে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মাযহাব, তার দলিল, এতদসম্পর্কিত হাদীস ও কিয়াস উল্লেখ করেন।

কিতাবটি খলিফা মামুনের হাতে পৌঁছলে তিনি কিতাবটি পাঠ করে বললেন,

هذا جواب القوم اللازم لهم.

"এটা তাদের পক্ষ থেকে সমুচিত জওয়াব।"

অতঃপর তিনি নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করেন–

حسدوا الفتى إذا لم ينالوا سعيه
فالناس أعداء لها و خصوم
كضرائر الحسناء قلن لزوجها
حسدا و بغيا :إنه لذميم

"লোকেরা সেই যুবকের মর্যাদা ও উচ্চাসন লাভ করতে না পেরে তাঁর সাথে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে যেমন নারীরা হিংসা ও বিদ্বেষবশত তাদের সুন্দরী সতিনের মন্দচারিতা স্বামীর কাছে প্রকাশ করে থাকে।"

এ চার মাযহাব সেই তিন যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেই তিন যুগ সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন,

خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم

সর্বোত্তম মানুষ হলো, আমার যুগের মানুষ। অতঃপর পরবর্তীগণ। অতঃপর তাদের পরবর্তীগণ।

(সহীহ বোখারী, হাদীস নং ৩৪৫১ , ৬০৬৫, ২৫০৯, ৬২৮২, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৩৩)

এই হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ডাক্তার জাকির নায়েক তাঁর "ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ" শিরোনামের লেকচারে বলেছেন,

There is a Hadith of Sahih Bukhari, volume number 3, Hadith number 2652, the prophet said: the best of the people are those of my time, means the companions, the Sahabas. After that the next generation. After that the next generation. The prophet said: the best people are those of my generation, the Sahabas. After that the next generation, the Tabieen, after that the next generation, Tabe-tabeen. Finish.

If you have to take anything, you have to take from the generation of the prophet, the companion, then the next generation Tabieen, and Tabe- tabieen. That's it. Three generation. These we call as the Salafe-Saleheen.

"সহীহ বোখারী ২৬৫২ নং হাদীসে আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, সর্বোত্তম মানুষ হলো, আমার যুগের মানুষ অর্থাৎ রাসূল (সা.)-এর সাহাবীগণ। অতঃপর পরবর্তীগণ। অতঃপর তাদের পরবর্তীগণ।

রাসূল (সা.) বলেছেন, সর্বোত্তম মানুষ হলো, আমার যুগের মানুষ। অতঃপর তাদের পরবর্তী অর্থাৎ তাবেঈনগণ। অতঃপর তাদের পরবর্তী তবেতাবেঈগণ। ব্যস! যদি তোমার কিছু গ্রহণ করতে হয়, তবে তোমাকে রাসূলের (সা.)-এর সাহাবীদের থেকে কিংবা তাদের পরবর্তী তাবেঈনদের থেকে কিংবা তাদের পরবর্তী তবেতাবেঈনদের থেকে গ্রহণ করতে হবে। এ তিন যুগের মানুষকে আমরা সালফে-সালেহীন (সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত বুযুর্গ) বলে থাকি।"

ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ, http://qaazi.wordpress.com/2008/07/28/various-public-lectures-by- dr-zakir-naik/

ডাক্তার জাকির নায়েক বলেছেন, যদি তোমাকে কিছু গ্রহণ করতে হয়, তবে এ তিন যুগ থেকে গ্রহণ করতে হবে। আর এটা কারও অজানা নয় যে, চার মাযহাবই এ তিন যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে আমাদের সামনে যে সমস্ত মাযহাব বা মতাদর্শের সৃষ্টি হয়েছে, যেমন সালাফী মাযহাব কিংবা যাহেরী মাযহাব এদের কোনোটিই চার মাযহাবের কোনো একটি মাযহাবের সমপর্যায়ের হওয়া তো দূরে থাক, তাদের সাথে কোনো দিক থেকে তুলনীয় হওয়ারও যোগ্য নয়। সুতরাং যে তিন যুগ সম্পর্কে রাসূল (সা.)-এর নির্দেশনা রয়েছে, যাদের কথা গ্রহণের ব্যাপারে রাসূল (সা.)-এর সুস্পষ্ট হাদীস রয়েছে, বর্তমানের অযোগ্য কারও অনুসরণের চেয়ে তাদের কোনো একজনকে অনুসরণ করাটাই যুক্তিযুক্ত এবং আবশ্যক।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : ইমামত

মুহা. আব্দুর রজ্জাক
মোমেনশাহী।

জিজ্ঞাসা :

একজন আলেম যদি নিয়মিত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ তরক করার অভ্যাসে পরিণত করে ফেলে, তবে তার ব্যাপারে কী হুকুম, আর উক্ত আলেমের দ্বারা দ্বীনি কার্যক্রম যথা–নামাযের ইমামতি, ঈদের নামাযের ইমামতি ইত্যাদি করানো যাবে কি না?

সমাধান :

নিয়মিত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ তরককারী ফাসেক বলে গণ্য হবে। এ ধরনের লোকের সর্বপ্রকার নামাযের ইমামতি মাকরুহে তাহরিমী। তবে তার চেয়ে উত্তম কোনো দ্বীনদার ব্যক্তি না থাকলে একা একা নামায না পড়ে তার পেছনে জামা'আতের সহিত নামায আদায় করবে। (রদ্দুল মুহতার ১/৫৬০, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/৫৩-৫৪)

প্রসঙ্গ : হজ

এস এম মোস্তফা
হবিগঞ্জ, সিলেট।

জিজ্ঞাসা-১

বদলি হজ করার সুরতে নিজের ওপর হজ ফরজ থাকলে বদলি হজ আদায় হবে কি না?

জিজ্ঞাসা-২

কা'বা শরীফ দেখলেই কি হজ ফরজ হয়ে যাবে?

জিজ্ঞাসা-৩

প্রবাসী অবস্থায় হজ করলে ফরজ আদায় হবে কি?

সমাধান-১

যার ওপর হজ ফরজ, এমন ব্যক্তি নিজের হজ আদায় না করে, অন্যের বদলি হজ করলে, তা আদায় হলেও মাকরুহে তাহরিমী বলে বিবেচিত হবে। (রদ্দুল মুহতার ৪/২৫, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৫১২)

সমাধান-২

শুধু কা'বা শরীফ দেখলেই হজ ফরজ হয় না বরং হজ আদায় পর্যন্ত অবস্থানের সামর্থ্য থাকলে তবেই হজ ফরজ হয়। (এমদাদুল আহকাম ২/১৯৯)

সমাধান-৩

প্রবাসী অবস্থায় হজ করলেও ফরজ হজ আদায় হয়ে যাবে। (তাহতাভী আলাদ্দুর ১/৪৮৮)

প্রসঙ্গ : মহিলাদের জামা'আত

মাও. রফীকুল ইসলাম
সেলিমপুর দারুল উলুম কওমী মাদরাসা, বরিশাল।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের এলাকার মসজিদগুলোতে মহিলাদেরকে জামা'আতে নামায আদায়ের ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। বিশেষ করে মসজিদের পাশে, পৃথক রাস্তার মাধ্যমে অথবা তৃতীয় তলায় পৃথক সিঁড়ির মাধ্যমে মসজিদে মহিলাদের প্রবেশের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, যাতে তারা মসজিদে গিয়ে জামা'আতের সাথে নামায আদায় করতে পারে। এখন আমার প্রশ্ন হলো, মহিলাদের জামা'আতের সাথে নামায আদায়ের জন্য মসজিদে যাওয়ার ব্যাপারে রাসূল (সা.)-এর যুগে কী হুকুম ছিল ও বর্তমান ফেতনা-ফ্যাসাদের যুগে কী হুকুম?

সমাধান :

শরীয়তের আলোকে মহিলাদের জন্য মসজিদে গিয়ে জামা'আত সহকারে নামায পড়ার নির্দেশনা নেই। বরং রাসূলে করীম (সা.) মহিলাদেরকে মসজিদে গিয়ে জামা'আতে নামায পড়ার চেয়ে ঘরে একাকী নামায পড়ার ওপর জোর দিয়েছেন এবং মহিলারা মসজিদে জামা'আতের সহিত নামায পড়া অপেক্ষা নিজ ঘরে একাকী নামায পড়াতে ফযীলত ও সওয়াব বেশি বলে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। মদীনা শরীফে রাসূলে করীম (সা.)-এর জীবদ্দশায় শুধুমাত্র মসজিদে নববীতে মহিলারা বিভিন্ন কারণে রাসূলে করীম (সা.)-এর পেছনে নামায পড়তেন। এরপর সাহাবায়ে কেরামের যুগে মহিলাদেরকে মসজিদে আসতে বারণ করা হয়েছে। তাই বর্তমান ফেতনা-ফ্যাসাদের যুগে মহিলাদের মসজিদে গিয়ে জামা'আত সহকারে নামায পড়া মাকরুহে তাহরিমী বা নাজায়েয। তাই এর অনুমতি দেওয়া যায় না। (সূরা আহযাব-৩৩, সহীহুল বুখারী ১/১২০)

প্রসঙ্গ : বিয়ে

মুহা. ফজলে রাব্বি
১১/৯, নর্দা, গুলশান-২, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আপন বোনের মেয়ের মেয়েকে বিয়ে করা যাবে কি না? বিয়ে হওয়ার ১০

বছর অতিবাহিত হয়েছে। তাদের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। এখন কী করা যাবে। কন্যা সন্তানের বয়স ৮ বছর। বিয়ের আগে আমরা স্থানীয় এক মাদরাসার হুজুরের কাছ থেকে শুনে পারিবারিকভাবে বিয়ে সম্পন্ন করেছিলাম।

সমাধান :

কুরআন-হাদীস তথা শরীয়তের অকাট্য বিধান মতে আপন বোনের মেয়ের মেয়েকে বিবাহ করা হারাম। তাই উক্ত বিবাহ ইসলামী শরীয়ত মতে বৈধ হয়নি। এখন তাদের জন্য একে অপর থেকে অবিলম্বে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে যাওয়া এবং স্বীয় কৃতকর্মের জন্যে লজ্জিত হয়ে তাওবা ও ইস্তিগফার করা জরুরি। উভয়ের ঔরসে যে সন্তান হয়েছে সে ওই পুরুষের বৈধ সন্তান হিসেবে গণ্য হবে। (সূরা নিসা-৩৩, রদ্দুল মুহতার ৪/৯৯)

প্রসঙ্গ : কোয়ান্টাম মেথড

মাও. দেলওয়ার হোসেন
কামরাঙ্গীর চর, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

ক. যারা কোয়ান্টাম মেথডের অনুসারী, যথারীতি ওখানকার সব নিয়ম-কানুন মেনে চলে তাদের ঈমান আকীদার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী?

খ. কোয়ান্টাম মেথডের একজন কর্মচারী, যিনি ওখানকার বড় একজন দায়িত্বশীল ও অনুসারী। তার সাথে একজন পর্দানশীন নামাযী ও শরীয়তের পূর্ণ পাবন্দ মেয়ের বিবাহ হয়েছে। শরীয়তে এই বিবাহ সহীহ হয়েছে কি না?

গ. যদি কোয়ান্টাম মেথডের অনুসারীদের ঈমান-আকীদায় গলদ থাকে তাহলে তাদের ফিরে আসার উপায় কী?

ঘ. যারা কোয়ান্টাম মেথডে চাকরিরত এবং অনুসারী, ওখানকার বেতন তাদের জন্য হালাল না হারাম?

সমাধান :

ক. কোয়ান্টাম মেথড দীর্ঘদিন যাবত আমাদের দেশের আধুনিক মানুষের অশান্ত মনে প্রশান্তি আনার স্লোগান নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। পশ্চিমা বিশ্বে বহুল প্রচলিত মেডিটেশন (ধ্যান), –যা চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে– এ দেশে আমদানি করে চমক সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে। ধ্যান-সাধনার অন্তরালে সরলমনা মুসলমানদেরকে ইসলামবিরোধী কৃষ্টিকালচার শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে। একদিকে ওরা ঈমান আকীদা ধ্বংস করে অন্যদিকে কোর্স ফি, হিলিং ফি, মাটির ব্যাংক ইত্যাদির মাধ্যমে হাতিয়ে নিচ্ছে কোটি কোটি টাকা।

সাদাকা আর হক্কুল ইবাদের নামে সংগৃহীত টাকা দিয়ে বান্দরবানের লামায় গড়ে তুলেছে খ্রিস্টপল্লী।

কোয়ান্টাম মেথড তার অনুসারীদের মুক্ত বিশ্বাসের নামে কুফর-শিরকের মতো ভ্রান্ত বিশ্বাসে বিশ্বাসী হতে বলে। দৃষ্টিভঙ্গি বদলের নামে কৌশলে ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের আহ্বান জানায়। জীবনযাপনে বিজ্ঞান অনুসরণের কথা বলে নবীজি (সা.)-এর আদর্শ বিচ্যুত করে।

যেমন : ১. গাইরুল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলা হয়েছে– "দিনে বার বার বলবে শোকর আল হামদুলিল্লাহ, থ্যাঙ্কস গড, হরিওম, প্রভুকে ধন্যবাদ বেশ ভালো আছি।" (কোয়ান্টাম কণিকা, পৃ. ২৩৯)

অথচ কুরআনের বহু আয়াতে গাইরুল্লাহকে অস্বীকার করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, "নিশ্চয়ই তারা কাফের, যারা বলে আল্লাহ তিনের এক, অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। যদি তারা স্বীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরে অটল থাকবে, তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে।" (সূরা আল মায়েদা, ৭৩)

"তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই।" (সূরা আল হাশর, আয়াত নং ২৩)

"স্থির করো না আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য। তাহলে তুমি নিন্দিত ও অসহায় হয়ে পড়বে।" (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত নং ২২)

"যে কেউ আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকে, তার কাছে যার সনদ নেই, তার হিসাব তার পালনকর্তার কাছে আছে, নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম হবে না।" (সূরা মুমিনুন, আয়াত ১১৭)

২। একত্ববাদ বহু ইশ্বরবাদ ও নাস্তিক্যবাদসহ সকল ধর্মদর্শনের সমর্থন ও প্রচার।

কোয়ান্টাম বলে– "আসলে একজন খ্রিস্টান যদি নিয়মিত কোয়ান্টায়ন করে তাহলে তিনি একজন ভালো খ্রিস্টান হবেন, সন্তে রূপান্তরিত হবেন। একজন মুসলমান যদি নিয়মিত কোয়ান্টায়ন করেন, তাহলে তিনি একজন ভালো মুসলমান হবেন, বুজুর্গে রূপান্তরিত হবেন। একজন হিন্দু যদি নিয়মিত কোয়ান্টায়ন করেন তাহলে তিনি একজন ভালো হিন্দু হবেন, ঋষিতে রূপান্তরিত হবেন। একজন বৌদ্ধ যদি নিয়মিত কোয়ান্টায়ন করেন তাহলে তিনি একজন ভালো বৌদ্ধ হবেন, ভিক্ষুতে রূপান্তরিত হবেন।" (হাজারো প্রশ্নের জবাব, পৃ. ১/২৩৯)

"কোয়ান্টম প্রত্যেককে উৎসাহিত করে আন্তরিকভাবে নিজ নিজ ধর্মপালনে।" (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস, পৃ. ১৪৩)

অথচ পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট ঘোষণা

হচ্ছে- "নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯)

"যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরা অলে ইমরান, আয়াত ৮৫)

"তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এই দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের ওপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।" (সূরা আত্তাওবাহ, আয়াত ৩৩)

পবিত্র হাদীস শরীফে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন–

"যদি আমার ভাই মুসা (আ.) জীবিত থাকতেন তাহলে তাকে আমারই অনুসরণ করতে হতো। (মুসনাদে আহমদ হা. ১৫১৫৬)

৩। তাকদীর তথা ভাগ্যলিপির মতো ইসলামের অন্যতম মৌলিক বিশ্বাসকে অস্বীকার। মানুষকে সর্বেসর্বা সকল ক্ষমতার মালিক মনে করা।

কোয়ান্টাম বলে- "ভাগ্য কি এটাকে আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারি। যেমন আল্লাহ মানুষের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন যে, তার মাথায় কোনো দিন শিং গজাবে না। কিন্তু গরু বা গণ্ডারের মাথায় শিং গজাবে। মানুষের মাথায় শিং থাকবে না, কিন্তু গরু বা গণ্ডারের মাথায় থাকবে এটা হচ্ছে ভাগ্য। আবার আমাদেরকে খেতে হয় মুখ দিয়ে। আমাদের হাত দুটি-তিনটি বা চারটি নয়, এটা হচ্ছে ভাগ্য। এটা হচ্ছে ডিএনএ প্রোগ্রামিং, এটাই কিতাবে লিখে রাখা হয়েছে, বাকি সবটাই হচ্ছে কর্ম।

বাকি সব কিছু করার জন্য আল্লাহ স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছেন। যে বিষয়গুলোতে আমাদের জবাবদিহি করতে হয় সে পুরো জিনিসটাই হলো কর্ম। কারণ যদি আমি কী করব এটা পূর্বনির্ধারিতই হয়ে থাকে তাহলে আমার তো প্রতিদান-প্রতিফলের কিছু থাকতে পারে না।" (হাজারো প্রশ্নের জবাব ১/২৭২)

অথচ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে –

"আমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আল কামার, আয়াত ৪৯)

"আমি তোমাদের মৃত্যুকাল নির্ধারিত করেছি এবং আমি অক্ষম নই।" (সূরা ওয়াকিয়াহ, আয়াত ৬০)

"তোমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অভিপ্রায়ের বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পারো না।" (সূরা তাকভীর, আয়াত নং ২৯)

"মানুষ যা চায় তাই কি পায়? অতএব, পরবর্তী ও পূর্ববর্তী সব মঙ্গলই আল্লাহর হাতে।" (সূরা আন নাজম, আয়াত ২৪-২৫)

হাদীস শরীফে আছে, "এক সাহাবী নবীজি (সা.) কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যে সকল ঝাড়ফুঁক ব্যবহার করি বা নিরাময়ের জন্য যে ওষুধ ব্যবহার করি এবং যে সকল ক্ষতিকর জিনিস আমরা পরিহার করে চলি এগুলো কি তাকদীরকে বদলে দিতে পারে? নবী (সা.) উত্তর দিলেন যে, এসব বস্তুও তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত।" (তিরমিযী শরীফ, হাদীস ২১৪৮)

হযরত সুরাকা ইবনে জুসুম (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর রাসূল! আমল কি যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে এবং ভাগ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে তার অন্তর্ভুক্ত, নাকি নতুন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত? তিনি বললেন, যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে এবং ভাগ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে তারই অন্তর্ভুক্ত। আর প্রত্যেকের জন্য ওই পথই সহজ হয়, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (ইবনে মাজাহ, পৃ. ১০)

অতএব এ কথা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, কোয়ান্টামের এ সকল মতাদর্শ কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিধানের সাথে চরম সাংঘর্ষিক। তাই কোনো মুসলমান তাদের অনুসারী হতে পারে না। পবিত্র কুরআনের কোনো বিধানকে অস্বীকার করলে ঈমান থাকে না।

সমাধান : খ.

তাওবা করে ফিরে না এলে কোয়ান্টামের উদ্ভাবিত কুফরী মতাদর্শে বিশ্বাসী কোয়ান্টিয়ারদের সাথে মুসলমানের বিবাহ শুদ্ধ হবে না। অজান্তে হয়ে গেলে তাওবা করে বিবাহ দোহরাতে হবে। (ফতহুল কাদীর ৫/৩১৯, রাদ্দুল মুহতার ৪/২৪৭, কিফায়াতুল মুফতী ১/৩০২)

সমাধান : গ.

ফিরে আসার জন্য দরকার সৎ ইচ্ছা ও সৎসাহস। আল্লাহ তা'আলার ক্ষমার দরজা সদা উন্মুক্ত। বিগত দিনের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়ে কোয়ান্টামের সকল ধর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করে খাঁটি দিলে তাওবা করলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই মাফ করে দেবেন। (ইবনে মাজাহ হা. ৪২৫, রাদ্দুল মুহতার ৪/২২৭, কিফায়াতুল মুফতী ১/৫৭)

সমাধান : ঘ

কোয়ান্টাম মেথডের মতো ঈমানবিধ্বংসী কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা, তাদের চাকরি ও বেতন গ্রহণ কোনোটাই বৈধ হবে না। (মাআরিফুর কুরআন ২/৫৮৪, এমদাদুল ফতাওয়া ৪/১৪২, ফতাওয়ায়ে দারুল উলূম ১৫/৩৩০, আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল ৬/৫৯)

(বি. দ্র. কোয়ান্টাম সম্পর্কে বিস্তারিত পড়ুন মাসিক আল-আবরার ফেব্রুয়ারী ২০১২ থেকে ডিসেম্বর ২০১৩ইং)

ইসলামে মানবাধিকার-৬

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

স্বাধীনতা :

ইসলামের আগমন মানবতার জন্য প্রকৃত স্বাধীনতার সুসংবাদ। ইসলাম আগমনের পূর্বে মানুষ বিভিন্ন প্রকার গোলামী ও বন্দিত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং মানবতার সম্মানের যে চিন্তা-চেতনা ইসলাম দিয়েছে তা-ই কিছু বিকৃতি, কিছু সংযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে দুনিয়ার অন্যান্য ধর্ম, দেশ ও জাতি নিজেদের মাঝে উপস্থাপন করছে। আবার নিজেদের এমন বিকৃত চিন্তা-চেতনাকেই আধুনিকতা ও প্রগতির নামে সারা দুনিয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার চেষ্টায় মত্ত রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো।

ইসলামপূর্ব ঐশী ধর্মগুলোতে যাবতীয় বিষয় পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা ছিল না। তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দ্বীনকে সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, এমন ঘোষণাও দেওয়া হয়নি। তথাপি ওই সব ঐশী ধর্মে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন বিকৃতির কথা সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত সত্য। তা ছাড়া ইসলাম আগমনের পর পূর্বেকার সকল ধর্ম রহিত হওয়ার কথা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা।

ইসলাম আগমনের পর তারা বাস্তবপক্ষে ইসলাম গ্রহণ না করলেও ইসলামের ব্যাপক সফলতা ও বিজয় দেখে ইসলামেরই বিভিন্ন রীতিনীতি গ্রহণপূর্বক নিজেদের সমাজে প্রতিষ্ঠা করে। এটিই কারণ, ইসলামপূর্ব যুগে মানুষের অধিকারটুকুরও ধারণা যাদের ছিল না এখন তারা দুনিয়াব্যাপী মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠাতা। নিজ নিজ ধর্মকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে যুগ যুগ ধরেই গণহত্যা, ঝগড়া-ফ্যাসাদেই যাদের জীবন অতিবাহিত হয়, তারাই এখন ধর্মনিরপেক্ষতা বা ধর্মীয় স্বাধীনতার স্লোগানে মুখর। যাদের কারো কারো কাছে এই সন্দেহ ছিল, নারীরা মানুষ কি না? যাদের বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল, নারীরা দুনিয়ার সর্বনিকৃষ্ট প্রাণী, তারাই এখন নারী স্বাধীনতার ধারক-বাহক, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার মুরব্বি।

অথচ ইসলামের যে নীতি-আদর্শ তা থেকে পরিপূর্ণ উপকার অর্জন করতে হলে ইসলামের ব্যাখ্যা যেভাবে, সেভাবেই গ্রহণ করতে হবে। তা থেকে একেকটি ধারার ওপর গবেষণা চালিয়ে তাতে বিকৃতি সাধন ও সংযোজন-বিয়োজন করে সমাজে প্রতিষ্ঠা করলে না মানবতার বাহ্যিক কোনো উপকার হবে, না আধ্যাত্মিক। আবার এই কার্যক্রম যদি হয় স্বয়ং ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যে, তার ভয়াবহ পরিণতি তো আছেই।

ইসলামে ব্যক্তিস্বাধীনতা :

ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকারের অর্থ হলো, ইসলামী রাষ্ট্রে কাউকেও আইনি বৈধতা ছাড়া গ্রেফতার করা যাবে না, না তার স্বাধীনতার ওপর কোনো প্রকারে হস্তক্ষেপ করা যাবে। কোনো নাগরিকের প্রতি হস্তক্ষেপ করতে পারার জন্য আদালতের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা আবশ্যক। কারণ ইসলাম ব্যক্তিস্বাধীনতাকে আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামত মনে করে থাকে।

সুনানে আবু দাউদের একটি বর্ণনায় আছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মসজিদে খুতবা প্রদান করছিলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, আমার ওই বন্ধুকে গ্রেফতার কেন করা হয়েছে? রাসূল (সা.) খামোশ থাকলেন। আবার প্রশ্ন করা হলেও কোনো জবাব রাসূল (সা.) দেননি। তৃতীয়বার যখন একই প্রশ্ন করা হলো তখন রাসূল (সা.) উক্ত ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া আদেশ দিলেন।

এখানে রাসূল (সা.)-কে দুই বার প্রশ্ন করার পরও কোনো জবাব না দেওয়ার অর্থ হলো, মসজিদে উপস্থিত প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্তদের কাছে এ ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট বক্তব্য আছে কি না, এর জন্য অবকাশ দেওয়া। যখন তাদের পক্ষ থেকে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি তখন রাসূল (সা.) তাকে মুক্তি দেওয়ার আদেশ দিলেন।

হযরত উমর (রা.) মিসরের গভর্নর হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-কে বললেন, হে আমর! আপনি মানুষকে কখন থেকে গোলাম বানানো আরম্ভ করেছেন, অথচ তার মা তাকে স্বাধীন হিসেবেই জন্ম দিয়েছেন। (আলফারুক ২/১৯৮)

ইসলামপ্রদত্ত ব্যক্তিস্বাধীনতায় নাগরিকের কোনো জায়গায় অবস্থান করা বা অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হওয়ার অধিকারও শামিল। খারেজীরা ইসলামের জঘন্য দুশমন হওয়া সত্ত্বেও হযরত আলী (রা.) তাদের এই অধিকার দিয়েছিলেন।

ইসলামে কারো ব্যক্তিস্বাধীনতা, সন্দেহ ও সংশয়ের কারণে খর্ব করা যায় না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ

الـظَّـنِّ إِنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

অর্থ : হে মুমিনগণ! অনেক রকম অনুমান থেকে বেঁচে থাকো। কোনো কোনো অনুমান গোনাহ। তোমরা কারও গোপন ত্রুটির অনুসন্ধানে পড়বে না এবং একে অন্যের গীবত করবে না। (হুজরাত ১২)

ইসলামে শাস্তিমূলক নীতিমালাগুলোর মূল উদ্দেশ্য শাস্তি দিয়ে মানুষকে কষ্ট দেওয়া নয়, বরং সংশোধন করাই মূল লক্ষ্য।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন–

ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان وجدتم لمسلم مخرجا فخلوا سبيله فان الامام ان يخطأ فى العفو خير من ان يخطأ بالعقوبة۔

"যথাসম্ভব মানুষের শাস্তি মওকুফ করে দাও। যদি তার জন্য কোনো ক্ষমার সুযোগ থাকে তাকে ক্ষমা করে দাও। কারণ ইমামের ভুল শাস্তি প্রদানের চেয়ে ক্ষমা করাই উত্তম। (সুনানে তিরমিযী ৪/৩৩, হা. ১৪২৪, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৫/৫১২ হা. ২৮৫০২, দারাকুতনী ৩/৮৪ হা. ৮, হাকেম ৪/৪২৬ হা. ৮১৬২)

ব্যক্তিস্বাধীনতায় ইসলামের বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত আগে আলোচনা করা হয়েছে।

ধর্মীয় স্বাধীনতা :

সমাজে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও নিজের রুচিমতো আমল করতে পারার অধিকারই ঈমান ও ইবাদতের স্বাধীনতার মূল ভিত্তি। এর ব্যাখ্যা হলো এই, প্রত্যেকে নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুসারে ধর্মগ্রহণের অধিকার রাখে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিটি ধর্মের লোকেরা নিজ নিজ গণ্ডিতে নিজ নিজ ধর্মের ইবাদত ইত্যাদি করতে পারার অধিকার দিয়ে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্র কোনো লোকের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না। সমাজের সদস্যদের ধর্মীয় দায়িত্বসমূহ আদায়ে ইসলাম পরিপূর্ণ অধিকার দিয়ে থাকে। আবার ধর্মগ্রহণের বেলায়ও ইসলাম কারো প্রতি জোরজুলুম করে না।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন –

لَا إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

অর্থ : দ্বীনের বিষয়ে কোনো জবরদস্তি নেই। হিদায়াতের পথ গোমরাহী থেকে পৃথকরূপে স্পষ্ট হয়ে গেছে। এরপর যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে সে এক মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরল, যা ভেঙে যাওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও সব কিছু জানেন। (বাকারা ২৫৬)

আরেক আয়াতে এসেছে –

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে ভূপৃষ্ঠে বসবাসকারী সকলেই ঈমান আনত। তবে কি তুমি মানুষের ওপর চাপ প্রয়োগ করবে, যাতে তারা সকলে মুমিন হয়ে যায়? (ইউনূস ৯৯)

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦)

অর্থ: বলে দাও হে কাফেরগণ! আমি সেই সব বস্তুর ইবাদত করি না, যাদের ইবাদত তোমরা করো এবং তোমরা তাঁর ইবাদত করো না, যার ইবাদত আমি করি। এবং আমি (ভবিষ্যতে) তার ইবাদতকারী নই, যার ইবাদত তোমরা করো এবং তোমরাও তার ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি। তোমদের জন্য তোমাদের দ্বীন এবং আমার জন্য আমার দ্বীন। (কাফিরুন)

وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

অর্থ : তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো ও রাসূলের আনুগত্য করো এবং (অবাধ্যতা) পরিহার করে চলো। তোমরা যদি (এ আদেশ থেকে) বিমুখ হও তবে জেনে রেখো, আমার রাসূলের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টরূপে (আল্লাহর হুকুম) প্রচার করা। (মায়েদা ৯২)

পবিত্র কুরআনে এ কথাও স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে মানুষ পর্যন্ত তাঁর পয়গাম ও বাণী পৌঁছানোর জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে। মানুষকে জোরপূর্বক মুমিন বানানোর জন্য প্রেরণ করা হয়নি। মানবতা যেন হকের প্রত্যেক বিভাগ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়। রাসূল (সা.)-এর এ দায়িত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে আলোকপাত করা হয়েছে।

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُون

অর্থ : তাবলীগ (প্রচার কার্য) ছাড়া রাসূলের অন্য কোনো দায়িত্ব নেই। আর তোমরা যা কিছু প্রকাশ্যে এবং যা কিছু গোপনে করো, সবই আল্লাহ জানেন। (মায়েদা ৯৯)

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ

অর্থ : আল্লাহ চাইলে তারা শিরক করত না। আমি তোমাকে তাদের রক্ষক নিযুক্ত করিনি এবং তুমি তাদের কাজকর্মের জিম্মাদারও নও। (আনআম ১০৭)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ

অর্থ : (হে নবী!) বলে দাও, হে লোক সকল! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য এসে গেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি হিদায়েতের পথ অবলম্বন করবে, সে তা অবলম্বন করবে নিজেরই মঙ্গলের জন্য আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতা অবলম্বন করবে, তার পথভ্রষ্টতার ক্ষতি তার নিজেরই ভোগ করতে হবে। আমি তোমাদের কার্যাবলির জিম্মাদার নই। (ইউনূস ১০৮)

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

অর্থ : তার পরও যদি তারা (অর্থাৎ কাফিরগণ) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (হে নবী!) তোমার দায়িত্ব তো শুধু স্পষ্টভাবে বার্তা পৌঁছানো। (নাহাল ৮২)

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

অর্থ : বলে দাও, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তো সত্য এসে গেছে। এখন যার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা কুফর অবলম্বন করুক। আমি জালেমদের জন্য আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি, যার প্রাচীর তাদেরকে বেষ্টন করে রাখবে। তারা পানি চাইলে তাদেরকে তেলের তলানীসদৃশ পানি দেওয়া হবে, যা তাদের চেহারা ঝলসে দেবে। কতই না মন্দ সে পানীয় এবং কতই না নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল। (কাহাফ ২৯)

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (٢١) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (٢٢)

অর্থ : সুতরাং (হে রাসূল) তুমি উপদেশ দিতে থাকো, তুমি তো একজন উপদেশদাতা। তোমাকে তাদের ওপর জবরদস্তি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। (গাশিয়া ২১-২২)

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থ : (হে মুসলিমগণ) তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে (ভ্রান্ত মাবুদদেরকে) ডাকে, তোমরা তাদেরকে গালমন্দ করো না। কেননা পরিণামে তারা অজ্ঞাতবশত সীমালঙ্ঘন করে আল্লাহকেও গালমন্দ করবে। (এ দুনিয়ায় তো) আমি এভাবেই প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপকে সুশোভন করে দিয়েছি। অতঃপর তাদেরকে নিজ প্রতিপালকের কাছেই ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তাদেরকে তারা যা কিছু করত সে সম্বন্ধে অবহিত করবেন। (আনআম ১০৮)

এমনকি দ্বীনের দাওয়াত সম্পর্কেও মুসলমানদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন অমুসলিমদের সাথে অত্যন্ত গম্ভীর ও ধৈর্যসহকারে দ্বীনের কথা বলেন। তাদের সাথে যেন আঘাতমূলক কঠোর ও শক্ত কথা বলা না হয়।

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

অর্থ : তুমি নিজ প্রতিপালকের পথে মানুষকে ডাকবে হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে আর (যদি কখনও বিতর্কের দরকার পড়ে, তবে) তাদের সাথে বিতর্ক করবে উৎকৃষ্ট পন্থায়। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক, যারা তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন এবং তিনি তাদের সম্পর্কেও পরিপূর্ণ জ্ঞাত, যারা সৎপথে প্রতিষ্ঠিত। (নাহাল ১২৫)

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلٰهُنَا وَإِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

অর্থ : (হে মুসলিমগণ!) কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবে না উত্তম পন্থা ছাড়া। তবে তাদের মধ্যে যারা সীমালঙ্ঘন করে, তাদের কথা স্বতন্ত্র এবং (তাদেরকে) বলো, আমরা ঈমান এনেছি সেই কিতাবের প্রতি, যা আমাদের ওপর নাযিল করা হয়েছে এবং

যে কিতাব তোমাদের ওপর নাযিল করা হয়েছে তার প্রতিও। আমাদের মাবুদ ও তোমাদের মাবুদ একই। আমরা তারই আনুগত্যকারী। (আনকাবূত ৪৬)

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

অর্থ : যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের সঙ্গে সদাচারণ করতে ও তাদের প্রতি ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন। (মুমতাহিনা-৮)

ইসলাম মুসলমানদেরকে ঈমানের ওপর সন্দেহ করতে নিষেধ করেছে। একটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় আছে, রাসূল (সা.) হযরত উসামা (রা.)-এর একটি বিষয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তা হলো তিনি এমন লোককে হত্যা করেছিলেন যে লোক হত্যার সময় কালেমা পড়তে ছিল। হযরত উসামা (রা.) বললেন, সে তো নিজের জান রক্ষার জন্য কালেমা পড়ছিল। তখন রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

افلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقالها ام لا

তুমি কি এর অন্তরে চিড়ে দেখেছো যে, তোমার জানা হয়ে গেল সে অন্তর থেকে কালেমা পাঠ করেনি?

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল, ইসলাম দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে হেদায়েত আর গোমরাহীর পার্থক্য স্পষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং ধর্ম গ্রহণের বেলায় মুসলিম সমাজে সংখ্যালঘুদের স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হবে। তারা ইসলামী সমাজে বসবাস করে ইসলামের প্রমাণ ও দলিলের আলোকে ইসলাম গ্রহণের রাস্তা গ্রহণ করবে বা তারা নিজের ধর্ম নিয়ে থাকবে।

মানব ইতিহাসে ধর্মীয় স্বাধীনতার এমন নজির পাওয়া যায় না যে, যেখানে শুধু ধর্মগ্রহণে জোর খাটানো নিষেধ করা হয়েছে তা নয়, বরং অন্যান্য ধর্মের প্রতি কোনো প্রকার দখলদারিত্ব করতেও নিষেধ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা সংখ্যালঘুদের অধিকার অধ্যায়ে করা হবে ইনশাআল্লাহ।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম
বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪

আত্মশুদ্ধির পথে মাসিক আল-আবরারের স্বার্থক দিকনির্দেশনা অব্যাহত থাকুক

টাইলস এবং সেনিটারী সামগ্রীর বিশ্বস্ত ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

Importers & General Marchant of Sanitary Goods & Bath Room Fittings

J.K SANITARY

Shop # 10, Green Super Market (Ground Floor) Green Road Dhaka 1205, Bangladesh
Tel : 0088-02-9135987 Fax : 0088-02-8121538 Mobile : 0088-01675 209494, 01819 270797
E-mail: taosif07@gmail.com

Rainbow Tiles

2, Link Road, Nurzahan Tower, Shop No: 09
80/20 Mymansing Road, Dhaka, Bangladesh
Tel : 0088-02-9612039,
Mobile : 01674622744, 01611527232
E-mail: taosif07@gmail.com

Monalisa Tiles

25/2 Bir Uttam C.R. Dutta Road
Hatirpool, Dhaka, Bangladesh.
E-mail: taosif07@gmail.com
Tel: 0088-029662424,
Mobile: 01675303592, 01711527232

বি.দ্র. মসজিদ মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে আল-আবরার

নিউ রূপসী কার্পেট

সকল ধরনের কার্পেট বিক্রয় ও
সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

স্বত্বাধিকারী : হাজী সাইদুল কবীর

৭৩/এ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
ফোন : ৮৬২৮৮৩৪, ৯৬৭২৩২১

বি.দ্র. মসজিদ মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে

AL MARWAH OVERSEAS
recruting agent licence no-rl156

ROYAL AIR SERVICE SYSTEM
hajj, umrah, IATA approved travel agent

হজ, ওমরাসহ বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং ও সকল এয়ারলাইন্স টিকেটিং অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে অল্পখরচে দ্রুত সম্পন্ন করা হয়।

Shama Complex (6th Floor)
66/A Naya Paltan, V.I.P Road
(Opposite of Paltan Thana East Side of City Haeart Market)
Dhaka: 1000, Bangladesh.
Phone: 9361777, 9333654, 8350814
Fax 88-02-9338465
Cell: 01711-520547
E-mail: rass@dhaka.net

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সর্বপ্রকার বাতিলের মোকাবেলায় এগিয়ে যাবে
"আল-আবরার" এই কামনায়

জনপ্রিয় ১৯৩৭ সাবান

প্রস্তুতকারক

হাজী নুরআলী সওদাগর এন্ড সন্স লিঃ

চাক্তাই, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

ফোন : বিক্রয় কেন্দ্র : -০৩১-৬৩৪৯০৫, অফিস: ০৩১-৬৩২৪৯৩, ৬৩৪৭৮৩